সোনালি দিনের পাখিরা

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

উৎসর্গ

রঞ্জিতকুমার সেনগুপ্ত
আশীষ মজুমদার ও
প্রতিমা মজুমদারকে

লেখক

অবিস্মরণীয় এক সাহিত্যিক প্রেমকাহিনী

বঙ্গদেশে, ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের এই শুরু পর্যন্ত, কত রকমের প্রেমের ঘটনা দেখা ও শোনা গেল, এবং বঙ্গভাষার ঔপন্যাসিক গল্পকাররা বিভিন্ন ধরনের নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে কত কাহিনীই যে লিখলেন তার সীমাসংখ্যা হয় না!

কিন্তু বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদিকা ও নবীন উঠতি লেখকের মধ্যে প্রণয়ের ঘটনা ঐ একবার। গল্প উপন্যাসে নয়, বাস্তবে।

কবে ঘটেছে এমন ব্যাপার? দু'চার বছরের মধ্যে? নাকি খোদ একেবারে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে?

প্রায় ৮০ বছর আগে, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়েছিল সেই অনবদ্য প্রণয় পর্ব! সময়কালটা আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, তখন মহারাণী ভিকটোরিয়ার রাজত্ব।

নায়ক-নায়িকার নাম গোড়াতেই বলব না। বরং কাহিনী আরম্ভ হোক। মাঝে মাঝে কিছু ইঙ্গিত, যাকে বলে হিন্‌টস দেওয়া থাকবে। শেষ পাতা উলটে দেখে নেওয়ার আগে পাঠক নিজেই মাথা খাটিয়ে বার করুন না নায়ক-নায়িকার পরিচয়।

অতি চিত্তাকর্ষক পটভূমিকা একটু বুঝে নেওয়া যাক। অভিজাত মাসিকপত্রটির নাম সবাই চেনে একডাকে। প্রণয় পর্বের সময়ে এটি নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একটানা প্রায় ২৩ বছরে পদার্পণ করলো বলে। অবশ্য, একক কোনো ব্যক্তি এই দীর্ঘ সময় ধরে মাসিক-পত্রটির সম্পাদকপদে আসীন থাকেন নি। সম্পাদক বদলী হয়েছেন বেশ কয়েকবার। আমাদের নায়িকা উচ্চশিক্ষিতা তরুণীটি সম্পাদনার হাল ধরেছেন অতি সম্প্রতি। ১৮৯৯-র ঘটনা যখন, তখন তো আর না বললেও চলে, বঙ্গভাষার সবচেয়ে খ্যাত ব্যক্তি ৩৮ বছরের রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যা-সাগর বঙ্কিমচন্দ্র নেই। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র থাকলেও তাঁদের লেখার

জেল্লা ও খ্যাতি দ্রুত কমে আসছে। তাই পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ চললেও—রবীন্দ্রনাথ নামক এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সকলের কাছেই পরিষ্কার। বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরো কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম দিকে, আলোচ্য মাসিকপত্রটির মাধ্যমেই প্রধানত আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন।

এবার নবীন লেখকের খোঁজ নিই। ওঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ প্রায় চার বছর আগে থেকে। গোড়া থেকে তিনি গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত। শুরুতে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়নি। উদগ্র আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে লম্বা চিঠি পাঠিয়ে জানাতেন মতামত। চিঠিগুলিতে ভক্তের উচ্ছ্বাস ছিল—ঠিক, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল অনাবিল সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ খানিক নির্ভুল ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এ কারণে চিঠিগুলির নিয়মিত জবাব দিতেন। রবীন্দ্র-নাথের লেখা প্রথম চিঠিটি পেয়ে তাঁর মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল, তা একটু দেখা যাক।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫

"প্রিয় রবীন্দ্রবাবু, আজ আমার বড় শুভদিন। আজ আমি আপনার পত্র পাইলাম। আমি শুক্রবার ডাকগাড়ির পর সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ডাকঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ডাকবাবুর 'মেল লিস্ট' লেখা আর হয় না, 'মেল ব্যাগ' খোলা আর হয় না। অবশেষে 'মেল ব্যাগ' খোলা হইল। রাজ্যের মহাজনদের হিন্দী ঠিকানা লেখা চিঠি, কুলিওয়ালা সর্দারদের চিঠি, তাহার সঙ্গে আপনার চিঠি একত্রে বাঁধা থাকিবে ইহাতে আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। ডাকবাবু এক-একখানা চিঠির ঠিকানা পড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিতে লাগিলেন। প্রতিবার আমি মনে করিতে লাগি-লাম এইবার অপরিচিত হস্তাক্ষরে আমার নাম লেখা দেখিতে পাইব। অবশেষে সব চিঠি ফুরাইয়া গেল, আমি মলিন মুখে ফিরিয়া আসিলাম। কখন-কখনও এমন হয়, মেল ক্লার্কদের দোষে পত্র ওভারক্যারেড হইয়া চলিয়া যায়, আবার ডাউন মেল-এ উজান বহিয়া ফিরিয়া আসে। সেই আশায় ডাউন মেলের সময়ও ডাকঘরে গেলাম, কিন্তু পূর্বের মত ফিরিয়া

আসিতে হইল। এ কয়দিন এইরূপ প্রত্যহ ফিরিয়া আসিয়াছি। আজ ৪ ফেব্রুয়ারি—আমার দ্বাবিংশতম জন্মদিন। আজ আপনার পত্র পাই-লাম। ইংরাজি না পড়িলে হয়ত ইহাকে অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া অন্য কিছু বলিতাম। যাহা হউক, ইহা আমার পক্ষে বড় সুখের অ্যাক্সিডেন্ট। এই-দিন আমার জীবনের একটি পরম স্মরণীয় দিন হইয়া রহিল।······ছবির কথা, চেষ্টা-ফেষ্টা শুনিব না। ছবি দিতেই হইবে। না থাকে, নূতন ছাপাইয়া দিতে হইবে। আপনি কলিকাতায় আসিবার পরে আমি ছবি চাই-ই চাই।”

রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন নিজের কোনো ছবি নেই। অন্য কার কাছ থেকে একখানা চেয়ে নিয়ে ছবি পাঠিয়ে দিলেন। সুন্দর ছবি। নবীন লেখক ছবি পেয়ে লিখছেন—“ছবি পাইলাম। ছবিখানির ইতিহাসও আমাকে দিবেন। কবে তোলা হইয়াছিল, কয়খানা ছাপানো হইয়াছিল, অন্য কপি-গুলি কাহার কাহার কাছে আছে, এ সমস্ত আমাকে লিখিবেন। ······ছবিতে একটা বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম। তাহাতে আপনার স্নেহময় দৃষ্টি পাইলাম না। ইহাকে বুঝি সাইড গ্ল্যান্স বলে? আপনি ত আমার পানে চাহিয়া নাই, অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন ছবি, যদি কলিকাতার ছাপাও পাইতাম, তাহা হইলে এ বিলাতী ছবি ফেলিয়া তাহাই লইতাম। যাহা হউক, একদিন আপনার স্নেহদৃষ্টি আমি পাইবই পাইব। সেই দিনের জন্য আশা করিয়া রহিলাম। ছবির প্যাকেট আজ সন্ধ্যাবেলায় পাইলাম। যখন প্যাকেট খুলিলাম, ছবি দেখিলাম, তখন ‘আধ আলো আধ ছায়া’। আপনি সন্ধ্যার কবি, তাই বুঝি সন্ধ্যার সময় আপনাকে প্রথম দেখিলাম?······”

ঠাকুরবাড়ী থেকে ‘সাধনা’ মাসিক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে। চমৎকার মাসিক পত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটির আয়ু মাত্র চার বছর। প্রথম তিন বছরের সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ বা শেষ বছরের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা কমিয়ে সম্পাদনার ঝামেলায় অস্থির—খবর পেয়ে ক্ষুণ্ণ নবীন সাহিত্যিক চিঠি লিখছেন—“সাধনা লইয়া আপনার

অধিকাংশ সময় কাটিতেছে শুনিয়া শঙ্কিত হইলাম। আপনি সাধনাই লিখিবেন, না আপনার কাজ করিবেন? আমরা আর খানকতক রাজা ও রাণী এবং মানসী, সোনার তরী চাহি। তাহা দিয়া যত পারেন সাধনা লিখিবেন। আপনি যদি সাধনা এবং কবিতা দুই-ই রাখিতে চান, তবে দুই-ই বিকলাঙ্গ হইবে—তাহা ছাড়া, অধিক পরিশ্রমে আপনার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে।"

অবশ্য 'সাধনা'-কে বড্ড ভালোবেসে ফেলতে দেরি হলো না। নতুন সংখ্যা হাতে আসতে দু'দিন দেরিতে উনি আনচান করেন। কিন্তু 'সাধনা'র মৃত্যুক্ষণটি ঘনিয়ে আসে দ্রুত। সেই মর্মান্তিক খবর পেয়ে চিঠি লিখছেন—"কল্য বৈকালে আপনার দিলদার নগরের ঠিকানায় লিখিত পত্রখানি পাইলাম। সাধনা আর বাহির হইবে না শুনিয়া কান্না পাইতে লাগিল। কোন আত্মীয় কিম্বা প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ শুনিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ মনে হইল। এবার শত্রুপক্ষ হাসিবে। সাধনা ত্রৈমাসিক হইবে শুনিয়া একজন বলিয়াছিল—'এবার হয়ে এসেছে। ক্রমে ষান্মাসিক হবে। বাৎসরিক হবে। ঘর থেকে বছর বছর এতগুলি করে টাকা গুনতে হয়।' আমি সগর্বে বলিয়াছিলাম, 'হু দি ডেভিল কেয়ারস ফর।' এবার আমি সে ব্যক্তির কাছে মুখ তুলিতে পারিব না। পুরাতন সাধনা-গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই প্রাণটা কেমন করিয়া ওঠে।"

নবীন লেখকের আর্থিক অবস্থা সুবিধের নয় মোটেই। দরিদ্রই বলা যায় হয়তো বা। বাবা রেলওয়ের সিগনালার। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী ১৮ বছরের মাথায় নবীন লেখকের বিয়েও হয়ে গেছে এক ত্রয়োদশীর সঙ্গে। কয়েক বছর পরে দুটি সন্তানের পিতা।

আমরা "নবীন লেখক" বলছি বটে, উনি কিন্তু তখন নিজেকে লেখক হিসেবে গণ্য করেন না। নিজের পরিচয় দেন—'সাহিত্য অনুরাগী'। টুকটাক কবিতা লেখার অভ্যেস আছে। রোমান্টিক কবিতা। গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে আদৌ সাহস নেই। ওঁর দৃঢ় ধারণা, সার্থক গল্প লেখা তাঁকে দিয়ে হবার নয়। কারণ ওঁর মতে, "ভাষার গাঁথুনির কাজ বড়ই শক্ত।"

উনি তো আর জানতেন না—পরবর্তীকালে তাঁকে গল্পেরই লেখক

হতে হবে। গদ্য রচনায় কি দুর্দান্ত খ্যাতি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে, সে কথা তাঁর তখন কল্পনারও বাইরে ছিল! যাই হোক, খুচরো রোমান্টিক কবিতা লেখার ফাঁকে নবীন লেখক ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে "দাসী" মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা লিখলেন। চমৎকার লেখা। বিশেষত, অতি সরস ভঙ্গীটি ভালো লেগেছিল অনেকের। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তৎকালীন সাহিত্য-রসিকদের অনুরাগ-বিরাগ প্রসঙ্গে যে সব অম্লমধুর মন্তব্য আছে তা অত্যন্ত উপভোগ্য। একটুখানি উদ্ধৃত করি—"যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্য যুবক—ইঁহারা সকলেই এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা।

(ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশু রায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ-পারিপাট্য এমনই লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়…। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহা দোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গ অবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিতেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—দেখুন, অমুক এমন হইয়াছে, হয়তো আমি তখন বলিব—কে অমুক? আরে না, না, ওসব বাজে কথা…। বৃদ্ধের কাছে, যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়। নূতন কিছুই (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) ভালো লাগে না। সুতরাং, নব্য কবির রচনা কেমন করিয়া ভালো লাগিবে?

(খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইঁহারা অনেকে হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা-হুতাশ করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাহার কারণ হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে

আঘাত করিয়া টুংটাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড় ছড় শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়।

(গ) যুবক—যুবকদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ হইয়া থাকে—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইঁহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর, ইঁহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে রবিঠাকুর আবার কবি! সত্য সত্য আমি এমন লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, যে কস্মিনকালে রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ, এমন কি একটিও কবিতা পাঠ করে নাই। কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জ্যাঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথেঘাটে ভদ্রলোকের মেয়ে দেখিলে কুৎসিত হাসি তামাশা করে। (৩) কোনো নূতন ভালো বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবিভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্প-গুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।…রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে, যদি কাহারও হৃদয়-বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয়-বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোনও ল্যাঠাই নাই। তাহার ভিতর এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করিতে পায় না। এমন লোক তর্ক

করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা তো করিবেই।"

'দাসী' মাসিক পত্রিকা বেশ চালু। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কাজেই গদ্য রচনার প্রথম আবির্ভাবেই নবীন লেখকের একটুখানি নাম হয়ে গেল। এবার ছদ্মনাম 'শ্রী রাধামণি দেবী'র আড়ালে দুটি ছোট গল্প—'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' ও 'বেনামী চিঠি' পাঠালেন 'প্রদীপ' নামক মাসিকপত্রে। ছাপাও হলো। প্রায় এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের সুযোগ ঘটে। এতোদিন লেখার মারফৎ চিনেছিলেন, এবার নিজের চোখে দেখলেন। নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ১২ বছরের ছোট। শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী তরুণ শুরু থেকেই আদায় করে নিলেন অকৃত্রিম স্নেহ। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেই নবীন লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখুনি। নিভৃতে বসে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। প্রকৃত ছোট গল্পের বিশেষত্ব কেমন হওয়া উচিত এবং লেখার কলাকৌশলই বা কি রবীন্দ্রনাথ তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। প্লট কিভাবে সাজাতে হয়, সে সম্বন্ধেও নবীন লেখক অনেক কিছু শিখলেন।

নবীন সাহিত্যিক যদিও সব সময়ে হাসিমুখে থাকেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর পারিবারিক জীবনে গুরুতর বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়েছে। দুটি সন্তান রেখে স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটলো। বাবারও মৃত্যু হলো। সংসারের সমস্ত ঝক্কি এখন নবীন সাহিত্যিকের কাঁধে। সামান্য চাকরি। তবে, মা এবং নিজের দুটি শিশুসন্তান নিয়ে ছোট্ট সংসার, তায় আবার শস্তা-গণ্ডার দিন তো—অল্প আয়েও কোনো রকমে চলে যায়।

নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে জোড়াসাঁকোর বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। সাদামাটা অথচ বুদ্ধিমান এই তরুণ সকলেরই প্রীতিভাজন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাইয়ের অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এলেন ফিরে। উঠেছেন বিরজিতলাও-এর বাড়িতে। [বাড়িটি এখন আর নেই। সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের উলটো দিকে আজ যেখানে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমি—সেখানেই ছিল এই বিখ্যাত বাড়িটি।] রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে নবীন সাহিত্যিক এ বাড়িতেও আসেন বেশ কয়েকবার।

এবার নায়িকা তরুণী সম্পাদিকার খোঁজ নিতে হয়। ওঁর মায়ের কথা অবশ্যই আগে বলে নেওয়া চাই। এই তরুণী বিদুষী মায়ের বিদুষী কন্যা। মা দুর্দান্ত খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা—একবাক্যে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। প্রকৃতি অত্যন্ত রাশভারি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে লেখা তাঁর উপন্যাসের নাম "দীপনির্বাণ।" এ ছাড়া বাংলা মাসিক পত্রের তিনিই প্রথম মহিলা সম্পাদক। মাসিক পত্রটি অনেক বছর আগে (১৮৮৪ খৃস্টাব্দ) একবার ডুবুডুবু হয়েছিল, তিনিই সে সময়ে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে অসামান্য কৃতিত্বে রক্ষা করেছিলেন সেটি। ডাকসাইটে রূপ, যাকে বলে চোখ-ধাঁধানো সুন্দরী।

কন্যা অবশ্য মায়ের রূপ পাননি। মুখশ্রী অতো অনুপম না। গায়ের রংও মায়ের মতন দুধেআলতার ধারেকাছে না। বাবার মত গায়ের রং, উজ্জ্বল শ্যাম। বাঙালা মেয়েদের গড়পড়তা হাইটের চেয়ে একটু বেশি লম্বা। খুব ভালো স্বাস্থ্য। মায়ের মাথায় একঢাল কালো কুচকুচে চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমেছিল, অতোখানি না হলেও কন্যাও কেশবতী। ডাগর চোখ দুটি চমৎকার। সব মিলিয়ে সুন্দরী নন—সুশ্রী বলা যায়। কিন্তু গুণ অনেকগুলি পেয়েছেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্না অতি দৃঢ় মানসিক গঠন। জটিল পরিস্থিতিতেও দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ রাখতে জানেন। প্রচুর পড়াশুনো। বাংলা লেখার হাত ভালো। অবশ্য ক্রিয়েটিভ রচনার শক্তি নেই এবং তাঁর লেখার মধ্যে প্রসাদগুণ এবং স্টাইলের অভাবও চোখে পড়ে। কিন্তু ঝরঝরে বাংলায় রিপোর্টাজ ধরনের লেখা কলমে বেশ আসে ওঁর। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপও কম নয়। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাশ করেছেন ইংরেজী অনার্স সহ। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে সুদূর মহীশূরে চলে গেলেন মহারাণী গার্লস স্কুলের অ্যাসিসটেনট সুপারিনটেনডেনটের পদে যোগ দিতে। কিছুদিন সেখানে কাটাবার পর শারীরিক অসুস্থতায় ছুটি নেন। পরে, বরদার মহারাণীর বিশেষ আমন্ত্রণে ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করলেন কিছুকাল। ১৮৯৮ নাগাদ কলকাতায় ফিরে আসেন।

বাবা-মার কাছে কাশিয়াবাগানের বাড়িতেই রইলেন। অবশ্য জোড়া-সাঁকোর বাড়িতেও তিনি যেতেন নিয়মিত। (কাশিয়াবাগানের বাড়ি আজ আর নেই। টলটলে জলে ভরা পুকুর ও বাগানে ঘেরা বাড়িটি ছিল চমৎকার। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই ও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এসেছেন একাধিকবার। আসতেন সে যুগের অনেক মনস্বী মনীষী। তরুণ রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোবাসতেন এ বাড়ির পুকুরে এপার ওপার সাঁতার কাটতে। তাঁর বেশ কিছু কবিতা, গান কাশিয়াবাগানের বাড়িতে লেখা। এ বাড়ি আজ গুঁড়া হয়ে মানিকতলার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ধূলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে···কর্পোরেশনের স্টীম রোলারের নীচে পড়ে চিরকালের জন্য গেছে অন্তর্হিত হয়ে।) অবশেষে একদিন মাসিক পত্রটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়েস ২৭। মনে রাখতে হবে, এই সম্পাদনার কাজ 'নাম কা ওয়াস্তে, নয়—সত্যি সত্যিই মাসিক পত্রটির ওপর একটানা সাত বছর ছিল তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব। প্রয়োজনে প্রুফ পর্যন্ত দেখতেন। নিয়মিত-ভাবে প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে বাজারে বার করতেন কাগজ। লেখকদের কিছু সম্মানদক্ষিণা বা উপহার দেয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ওঁর সম্পাদনায় মাসিক পত্রটির প্রচার সংখ্যাও বেড়ে যায় যথেষ্ট।

আচ্ছা—যত গুণবতীই হোন না কেন—কুমারী কন্যার বয়েস ২৭ বছর—সে যুগের পক্ষে তো বেশ বেশিই। এত দিনে উনি বিয়ে করেন নি কেন?

করতে চান নি আর কি! বাড়ি থেকে চাপাচাপি হয়েছে। কয়েকটি সম্বন্ধও এসেছিল। উনি গা করেন নি। বলেছেন, আপাতত ইচ্ছে নেই। পরে দেখা যাক কি হয়। বার বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে এড়িয়েই গেছেন। তবে কি মেয়ে বিয়েতেই আদৌ ইচ্ছুক নন? না, সে কথাও নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। 'বিয়ে করবো না'—এমন ধনুর্ভঙ্গ পণও মেয়ের নেই।

গুরুজনদের ধারণা, সম্বন্ধগুলি মেয়ের পছন্দ নয়। পছন্দমতো এবং যোগ্য পাত্র পেলে মেয়ে মত বদলাবে। যাই হোক, গুরুজনরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উদারপন্থী। বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার স্বাধীন ইচ্ছে-অনিচ্ছের

ওপর নিজেদের ইচ্ছের স্টীমরোলার চালানো উচিত মনে করলেন না।

এদিকে, আমাদের নবীন সাহিত্যিক জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন তো—এ ছাড়া মাসিক পত্রটিতে লেখা দেওয়া—ইত্যাদির ফাঁকে ধীরে ধীরে বিদুষী তরুণী সম্পাদিকার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। তুজনেই প্রায় সমান বয়সী। ক্রমে ক্রমে—"কি ছিল বিধাতার মনে।"

খুবই বিস্ময়কর যে ঘটনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে যুগে! স্ত্রী স্বাধীনতার অতি সামান্য হাওয়া সবে বইতে শুরু করেছে। তাও আবার সীমাবদ্ধ কয়েকটি পরিবারে। এখনকার তুলনায় সে যুগের পরি-বেশ—সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অনেক অনেক বেশি আঁটোসাঁটো। তরুণ তরুণীর নিভৃতে দেখা হওয়া ও মন দেওয়া-নেওয়ার অবকাশ ছিল খুবই কম। নেই বললেই হয়। এঁদের তুজনের দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হত সে কথা ঠিক। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তা অন্য কারুর না কারুর উপস্থিতিতে। এবং সে সব ক্ষেত্রে স্রেফ সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনাই থাকত মূল বিষয়। কিন্তু তাতে কি! ঐ সাহিত্য আলোচনার ফাঁকে কখন তুজনের মনের অনুরাগের নিভৃত পাপড়িটি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো। অবশ্য "আপনি" সম্বোধনেই কথা হয়। নবীন সাহিত্যিক যখন চিঠি লেখেন, [প্রেমপত্র নয় তাই বলে! কাজের চিঠি, মানে, লেখা ইত্যাদি সংক্রান্ত।] বা অন্য কারো কাছে লেখা চিঠিতে ঐ তরুণী সম্পাদিকার নাম উল্লেখ করতে গেলে, সম্বোধন করেন 'মাননীয়া—দেবী মহোদয়া।'

আরো কিছুদিন এগোলো। তুজনের অন্তরঙ্গতা একটু করে বাড়ছে। আবার, নবীন লেখকের নামও দ্রুত বাড়ছে। ওঁর সরস উজ্জ্বল ছোট গল্পগুলি পড়ে শুধু তরুণী সম্পাদিকাই নন, অনেকেই মুগ্ধ, বহু পাঠক-পাঠিকা নবীন সাহিত্যিকের গল্পের তারিফ জানিয়ে মাসিক পত্রের সম্পাদিকার কেয়ার অফে চিঠি পাঠান। সেই চিঠিগুলো পড়বার পর তার তলায় আণ্ডারলাইন করে প্রয়োজনমতো তু'চারটি মন্তব্য লেখেন সম্পাদিকা এবং তারপর ৫।৬ খানা করে চিঠি এক-একটি খামে ভরে নবীন লেখকের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোনো কোনো গল্প সম্বন্ধে তিনি

নিজেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন—যেমন, আপনি তো অমুক গল্পটা সম্বন্ধে অতোটা নিশ্চিত ছিলেন না, ঠিকমতো উৎরোবে কিনা সন্দেহে দোনোমোনো করছিলেন, এবার দেখুন পাঠকরা কি রকম নিয়েছে! আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম—ইত্যাদি।

নবীন লেখক দারুণ উৎসাহিত। দুজনের যোগাযোগ আরো এগোলো। সম্পাদিকা মাঝে-মধ্যেই চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করতে লাগলেন নবীন লেখককে। এবং পত্রপাঠ তিনি হাজিরা দিতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান। যদিও, আগেই উল্লেখ করেছি ওঁদের দুজনের সাক্ষাৎকার পরিবারের অন্য কোনো না কোনো পুরুষ বা মহিলার উপস্থিতিতে হতো। সম্পাদিকাকে নবীন সাহিত্যিক নানাভাবে সাহায্য করেন। এমন কি লেখা পাঠানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে ঘন ঘন তাগাদা দেওয়ার দায়িত্বও সাগ্রহে নিয়েছেন। গল্পের তাগিদ দিতে লেখা এমন এক অন্তরঙ্গ চিঠির একটুখানি—"রবিবাবু···আষাঢ় সংখ্যার জন্য গল্প আমি দিয়াছি। তাহা আপনি অবগত আছেন। এখন স্পষ্ট করিয়া, বাঙলা করিয়া বলুন দেখি শ্রাবণের জন্য যথাসময়ে আপনার গল্প পাওয়া যাইবে কিনা। আমাকে যত শীঘ্র পারেন একটি প্লট পাঠাইয়া দিবেন, ভাদ্রের জন্য সেটি এখন হইতে তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিব। আমি সম্পাদিকার ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমার কথা 'অথরিটেটিভ' মনে করিবেন। আপনাকে এক মাস অন্তর একটি করিয়া গল্প দিতে হইবে। ইহার বেশি কৃপা আপনাকে করা যাইতে পারে না···।" (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)

একটু আগেই আমরা জানিয়েছিলাম যে, ছোট গল্প যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে লেখার কায়দা এবং প্লট কি ভাবে সাজিয়ে এগোতে হয়, রবীন্দ্রনাথ তা নবীন লেখককে বুঝিয়ে দিতেন, শেখাতেন। নবীন লেখকের চিঠিতে ভাদ্র সংখ্যার জন্য গল্পের একটি প্লট পাঠিয়ে দেবার অনুরোধে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। ওঁর ৪টি বিখ্যাত গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথের দেয়া। অবশ্য নবীন লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে সেগুলিকে রূপ দিয়েছেন তা স্বীকার করতেই হবে। এর মধ্যের একটি

গল্পের নাম "দেবী", মজার তথ্য এই—ঐ গল্পের রূপায়নে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। সে প্রসঙ্গে উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যে চমৎকার চিঠিটি পাঠান তার একটুখানি উল্লেখ করছি। "প্রিয় রবিবাবু, শুনিলাম আমার 'দেবী' গল্প পড়িয়া আপনি নিরাশ হইয়াছেন, তাহার সাইকলজি পরিস্ফুট হয় নাই দেখিয়া। পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া মানুষ করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। যতই যত্ন কর, তাহার মায়ের মন কিছুতেই উঠে না। তাহার মা বলিবেই বলিবে—ঐ আমার মেয়ের অযত্ন হইল, 'দেবী'র একটা ফাইল পাঠাইতেছি এই ডাকে। একটু টাচ্ করিয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া? কিন্তু একটু শীঘ্র চাই, সপ্তাহান্তে ফিরিয়া দিতে হইবে।······আপনাকে এইরূপে বিপদগ্রস্ত করিলাম বলিয়া আপনার প্রতি অনুকম্পা হইতেছে। যদি নিতান্ত সময়াভাব বা অন্য প্রকারের বাধা বর্তমান থাকে তবে মেয়েকে ফিরিয়াই পাঠাইবেন। কিন্তু গরীবের ঘরের বধূ ধনী পিতার নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া থাকে, এ প্রথা বঙ্গদেশময় প্রচলিত আছে।" (৬ই আশ্বিন ১৩০৬)

বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ "দেবী"র ওপর কলম চালিয়ে "টাচ" করে দিয়েছিলেন।

আরেকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য যোগ করা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেও কখনোসখনো সামান্য অসঙ্গতি দেখতে পেলে নবীন লেখক ডুম করে বিনীত চিঠি মারফৎ তা জানিয়ে দিতেন!

এর থেকে অনুমান করতে দেরি হয় না রবীন্দ্রনাথের কতোখানি স্নেহ তিনি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

একটা উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'চোখের বালি'র কয়েকটি অধ্যায় লিখে এবং সংশোধন করে রেখে দেন। মানে, মাসিক পত্রে ধারাবাহিক বার হতে পারে এমন ৬।৭টি কিস্তি আর কি! প্রিয়জনদের তা পড়েও শোনাতেন। পরবর্তীকালে 'চোখের বালি' 'বঙ্গ-দর্শন (নবপর্যায়)' মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যাই হোক, নবীন লেখক পাণ্ডুলিপিটি জোগাড় করে খুব আগ্রহ সহকারে চোখের বালি'র খণ্ড অংশটি পড়লেন। রবীন্দ্রনাথের পড়াও শুনলেন।

বাড়ি ফিরে পরের দিন লিখছেন,

"প্রিয় রবিবাবু, কাল সমস্ত রাত্রি আপনার মহিন আর আশা আর বিনোদিনীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি।

বিনোদিনীর বয়স একটু বাড়ান অত্যাবশ্যক বটে। বিনোদিনী মহেন্দ্রর সঙ্গে যেরূপ ভাবে মেলামেশা করিতেছে তাহা হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কচি বউদিদিরা বয়সে বেশী বড় দেবরের সঙ্গে যদি কথাবার্তা কয়, তাহা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে। বিবাহের পূর্ব হইতেই মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর আলাপ ছিল করিলে কেমন হয়? তাহা হইলে বিনোদিনীর অল্প বয়সে কিছু আসে যায় না, 'বিনোদত্বও' বজায় থাকে। সেই একবার মহিন বিনোদিনীদের বাড়ি গিয়াছিল, তখন বিনোদিনী ৭।৮ বছরের। মহিনদাদার সঙ্গে তার ভারি ভাব হইয়াছিল। খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া মহিনদাদাকে ধূলার ভাত, কাদার দাল, খোলাংকুচির তরকারি দিয়া আতিথ্য করিয়াছিল। কচুপাতার পানও একটা বুঝি সাজিয়া দিয়াছিল।

আর একটা কথা। কাশীতে আশাকে বিরহবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য মহিন যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার মাসীমা সে পত্র দেখিলেন কেমন করিয়া? আশা লজ্জায় জড়সড়—মাসীমাকে গিয়া থোড়াই সে চিঠিখানা দেখাইয়াছে। অসাবধানতাবশতঃ আশা সে পত্রখানা কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল মাসীমা হঠাৎ সেখানা দেখিয়া ফেলেন—এইরূপ করিলেই ঠিক হয়।

নাইটডিউটির খাতিরে বাক্সপ্যাঁটরা বিছানাপত্র লইয়া মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রের হাসপাতালে গিয়া বাসা বাঁধা সম্ভব কিনা একবার সম্বাদ লইলে ভাল হয়। কোনও ছাত্র যে হাসপাতালে ডেরাডাণ্ডা করে এরূপ ত আমি শুনি নাই। সেরকম কোন বন্দোবস্ত আছে কিনা সন্দেহ। তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে মেডিক্যাল কলেজের নিকটবর্তী সেই মেসের বাসাটায়, যেখানে মহিনের দুইজন সহপাঠী পরম বন্ধু আছেন, সেখানে গিয়াও মহিন বাসা করিতে পারিবে। দুই দিন ত রাগ করিয়া মহিন তাহাদের বাসাতেই কাটাইয়া গিয়াছে......" (২ শ্রাবণ, ১৩০৬)

রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় 'চিরকুমার সভা' লিখছিলেন। তরুণী সম্পাদিকার একান্ত ইচ্ছে ওটি তাঁর মাসিক পত্রেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হোক। তাই তিনি এবং তাঁর পক্ষ নিয়ে নবীন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘন ঘন চিঠি লিখছেন শিলাইদহে।

নবীন সাহিত্যিক ও তরুণী সম্পাদিকার পারস্পরিক সম্পর্ক যে ক্রমেই মধুরতর ও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে তার কোমল আভাস রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা নবীন সাহিত্যিকের কয়েকটি চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। অতি সরস চিঠিগুলির সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।

(১) "আজ সন্ধ্যায়—দেবী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন একপাত্র সরবৎ গ্রহণ করিবার জন্য। আপনার বিদ্রোহিতা দমনের জন্য তাঁহাকে একটা পরামর্শ দিয়া আসিব কি ? নহিলে কিছু ঘুষ দিন। যদি না দেন, তবে বারান্তরে নিশ্চয়ই বলিয়া আসিব।" (২৪ আষাঢ় ১৩০৬)

(২) "চৈত্রের বিজ্ঞাপনে ব্যাপারটা এইরূপে ঘোষণা করা হইতেছে। 'বৈশাখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ধারাবাহিক গল্প আরম্ভ করিবেন। উহা উপন্যাস ও প্রহসনের মধ্য জাতীয়। বঙ্গ সাহিত্যে উহা সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী হইবে।' আশা করি আপনি সম্পাদিকা মহাশয়কে বিপন্ন করিবেন না। বেশি দেরি হইলে আপনার নামে টেলিগ্রাম যাইবে। এই গোপনীয় সংবাদ আপনাকে ফাঁস করিলাম।"

অবশেষে 'চিরকুমার সভা'র পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার টেবিলে এসে পৌঁছিল। নবীন সাহিত্যিক ঔৎসুক্য সামলাতে না পেরে, তরুণী সম্পাদিকাকে নিজের লেখা দুটি অগ্রিম গল্প দিয়ে, প্রকাশের আগেই 'চিরকুমার সভা'র পুরোটা নিলেন পড়ে, তারপর লিখলেন, "—দেবীকে উৎকোচ দিয়া 'চিরকুমার সভা' পাণ্ডুলিপিতেই পড়িয়া লইয়াছি। উহা মধু ও গুড় কোনও কোটাতেই পড়ে নাই বটে—কারণ উহা নেবু দেওয়া বরফ দেওয়া সরবৎ। আপনার অকারণ শঙ্কা দেখিয়া হাসি পাইতেছে। আমি আপনার চেয়ে ভাল 'টেস্টার'। আমি চাখিয়া বলিতেছি, পাঠক-সাধারণ "তৃপ্তোঽস্মি" বলিয়া আপনাকে আশীর্বাদ করিবে।"

নবীন সাহিত্যিক নিজের লেখা যে সব গল্প ও প্রবন্ধ তরুণী

সম্পাদিকার হাতে দিতেন—সম্পাদিকা, দরকার মতো, একটুখানি কলম চালিয়ে এডিট করে সেগুলি প্রকাশ করতেন তাঁর মাসিক পত্রে। নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে হল নবীন সাহিত্যিক তাঁর লেখায় এডিটিং-এর প্রশ্নে কিছু ক্ষুণ্ণ। তাই এ সম্বন্ধে তিনি তরুণী সম্পাদিকার কাছে চিঠি লিখলেন। তরুণী সম্পাদিকা আবার ঐ চিঠি পড়ে, নবীন সাহিত্যিককে 'সত্যিই আপনি রাগ করেন নাকি?' জিজ্ঞেস করায়, পুরো ব্যাপারটাই ফাঁস হয়ে যায়। বেচারা মহা অপ্রস্তুত! রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠালেন, "আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আপনি সম্পাদিকা মহাশয়াকে বলিয়াছেন যে, আমার লেখা কাগজে প্রকাশ করিবার সময়ে তাহাতে কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তনাদি করিলে আমি ক্ষুণ্ণ হই। যদিও সে ক্ষেত্রে কোনো মত প্রকাশ করিতে চাহি না।—আপনার প্রতি আবেদন এই যে, আমাকে জানিতে দেওয়া হউক, কবে আপনার নিকট এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি?"

অবশেষে 'দেবী' 'মহাশয়া' ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু নামটিই এলো রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা নবীন সাহিত্যিকের চিঠিতে। ব্যাপার হলো এই, তরুণী সম্পাদিকা এক বিকেলে লেখা চাইতে আসেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। চা খেতে খেতে সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানান কথা জমেছে। নবীন লেখকটির প্রসঙ্গও উঠল।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত দুজনের পারস্পরিক আকর্ষণ আঁচ করে নিয়েছিলেন আগে থেকে। এবং দুজনের মধুর কোমল সম্পর্কটি আরো নিবিড়ভাবে গড়ে উঠুক, তিনি তাও চেয়েছিলেন বোধ হয়। তাই নবীন সাহিত্যিকের লেখার প্রশংসা তো করলেনই সেই সঙ্গে তাঁর নানান চারিত্রিক গুণের সবিস্তার বর্ণনা-শেষে তারিফও করলেন বার বার। এমন মার্জিত সূক্ষ্ম রুচির ও সব দিক থেকে ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া যে খুব কঠিন, তারো ইঙ্গিত দিলেন।

কথাগুলো শুনে তরুণী সম্পাদিকা অবশ্যই খুশী। চার-পাঁচ দিন পরে নবীন লেখক যখন ওঁর দপ্তরে এলেন তখন সময় সুযোগ বুঝে অন্যের

কান বাঁচিয়ে সম্পাদিকা জানিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ ওঁর সম্পর্কে তাঁর কাছে কি কি তারিফ করেছেন।

বলা বাহুল্য যে, নবীন সাহিত্যিক এ সার্টিফিকেটে একটুখানি সঙ্কোচ-লজ্জার সঙ্গে অনেকখানি আনন্দ পেলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে চলে গেছেন শিলাইদহ। তরুণ লেখক তাঁর সদ্য প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'র উল্লেখ করে চিঠি লেখেন, 'রবিবাবু, আমার 'নবকথা' কেমন হয়েছে বলুন। আপনার 'নবকথা' আমি গত রবিবার দিন "—"কে পাঠিয়েছিলাম পারসোনালি ডেলিভারি করতে অনুরোধ করে। কিন্তু আপনি শিলাইদহে চলে গেলেন দেখে দেরি হ'ল।

আপনি '—' কে আমার সম্বন্ধে যা সব বলেছিলেন, আমি তা শুনেছি। এ কাজটা ভাল করেন নি। আমার গায়ে আপনি দেবত্বের মহত্ত্বের রঙ ফলিয়ে ত দিলেন। তারপর যখন রিয়েল লাইফে দেবতাটির ভেতর থেকে মাটি আর খড় বেরিয়ে পড়বে, তখন কি উপায় হবে দেবতার ?" (১লা পৌষ ১৩০৬)

প্রণয়ের সংবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুজনদের কানে পৌঁছলো। নবীন সাহিত্যিককে মেয়ের পক্ষের অভিভাবকেরা পছন্দ তো করতেনই। বুদ্ধিমান, রুচিসম্পন্ন, স্বভাবচরিত্র অতি নির্মল। আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু নবীন সাহিত্যিককে বাড়ির জামাইরূপে মেনে নেওয়ার সব চেয়ে বড় বাধা হল ওঁর আগের পক্ষের দুটি সন্তান। এমন পাত্রের সঙ্গে আদরিণী কন্যার বিয়ে দেবেন কি দেবেন না—অভিভাবকরা ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, স্বয়ং কন্যাই, নবীন সাহিত্যিকের দুই সন্তানের প্রশ্নে আপত্তির কোনো কারণ দেখছে না, এমন কি এ বিয়ের সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, তখন অভিভাবকরা আর বাধা দিলেন না।

কিন্তু আরেক জটিল সমস্যাও সামনে এসে দাঁড়ায়। নবীন সাহিত্যিকের অনেক গুণ থাকলেও চাকরি করেন যে অতি সামান্য। আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। এ হেন পরিস্থিতিতে বিদুষী কন্যার সঙ্গে এ

বিয়ে ঠিক খাপ খাবে কি ? আর্থিক অসচ্ছলতা এদের দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষ টেনে আনবে না তো ? কন্যা যথেষ্ট সচ্ছল পরিবেশে ও নানা আদবকায়দার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে, তার পক্ষে হঠাৎ দরিদ্র জীবনে মানিয়ে নেওয়া প্রকৃতপক্ষে কতখানি সম্ভব !

গুরুজনেরা নানা শলাপরামর্শ করেন। কিন্তু মুশকিলের আসান করে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি নবীন সাহিত্যিককে ইংলণ্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসার প্রস্তাব দিলেন। বছর তিনেক খেটে পড়লে পাশ না করার কারণ নেই। সমস্ত খরচখরচার দায়িত্ব তাঁর।

চমৎকার প্রস্তাব। কিচ্ছুটি বলবার নেই। বিদুষী তরুণী ও নবীন সাহিত্যিক—দুজনেই কয়েক বছর অপেক্ষায় রাজী। বিলেতে যাত্রার দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল।

সকলেই খুশী। কিন্তু নবীন সাহিত্যিক মনে মনে জানতেন, এই বিয়ে অতো সহজে হবার নয়। বরং প্রবল সাংসারিক অশান্তির সম্ভাবনা। কারণ, তাঁর পক্ষের একমাত্র অভিভাবিকা যিনি, অর্থাৎ তাঁর মা—তাঁকে রাজী করানো খুব কঠিন। মা অবশ্য চান ছেলে আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পাতুক। নতুন বধূ ঘরে আনতে গভীর আগ্রহী হলেও দরিদ্র গৃহস্থলক্ষ্মী সম্বন্ধে মায়ের চিন্তাধারা বিচারবোধ একেবারে আলাদা।

হিন্দু পরিবারের সেকেলে অতিরক্ষণশীলা মা ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়েতে মত দেবেন কি ? তার ওপর, বয়স্থা, অতো লেখাপড়া ইংরেজি জানা কন্যা বলে কথা ! সাধারণ বাঙালী সমাজ শ্লেষ করে যাঁদের উল্লেখ করতেন, 'জাতের ঠিকানা নেই, উড়নচণ্ডে, বেহায়া মেমসাহেব'। পুত্রবধূরূপে ওঁকে মা বরণ করবেন কি ?

ছেলে আবার মাকেও খুব ভালোবাসেন। তাই, মায়ের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষায় তাঁকে হেনস্থা করেন-ই বা কি ভাবে ?

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন নবীন সাহিত্যিক, অর্থাৎ মা-কে আপাতত কিছুই জানালেন না। বিয়ের কথা তো নয়ই—এমন কি বিলেত যাত্রার কথাও নয়। ঠিক করলেন ব্যারিস্টারি পাশ তো করে আসি, তারপর দেখা যাক।

কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিলেন। হিসেব করে দেখেন, তিনি যে সময়টা থাকবেন না—খুব সাধারণ ভাবে চালালে মা ও ছুটি সন্তানের খরচা কুলিয়ে যায় কোনোরকমে। ছুটি একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে এদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখারও ভার দিলেন। বেশি চিন্তায় আর লাভ নেই। এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

বিলিব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি জাহাজ-যোগে বিলেত রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সমুদ্রবক্ষ থেকে চিঠি লিখে মাকে খবর দিলেন—ব্যারিস্টারি পড়তে তিনি বিলেত চললেন। মা যেন দুশ্চিন্তা না করেন। তিনি যথাসময়ে ঠিক ফিরে আসবেন।

লম্বা পথ। ফ্রান্স ঘুরে তারপর ইংলণ্ড। দীর্ঘ যাত্রাপথে সমুদ্রপীড়া খুব কাবু করতে পারেনি তাঁকে। অন্যমনস্ক যাতে থাকতে পারেন, এই-জন্য জাহাজেই শুরু করলেন গল্প লিখতে। টুকটাক করে লেখা-ও হয়ে গেলো পরবর্তীকালের একটি বিখ্যাত গল্প—"কাশিবাসিনী"।

লণ্ডনে পৌঁছে জনৈক সদাশয় ইংরেজের গৃহে পেয়িং গেস্ট-রূপে রইলেন। বিখ্যাত বাঙালা ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন কর্মক্ষেত্র থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে বিলেতে। ওঁর কাছে নানা পরামর্শ নিতে যেতেন প্রায়ই। ব্যারিস্টারি পড়া আরম্ভ হলো। পড়াশুনো পুরোদমে চালালেও সাহিত্যচর্চা বন্ধ করেননি। সাধের মাসিক পত্রটির শুভাশুভ নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। ডাকের গোলমালে কোনো মাসের সংখ্যা খোয়া গেলে একেবারে অস্থির! বিলেত থেকেই গল্প পাঠাতেন কলকাতায় তরুণী সম্পাদিকার কাছে। সাধারণতঃ লিখতেন বৃটিশ মিউজিয়ামের বিরাট লাইব্রেরি ঘরে বসে। একদিন একটানা ৮।৯ ঘণ্টা লিখে একটি গল্প শেষ করে তরুণী সম্পাদিকার কাছে পাঠাবার পর সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে নবীন লেখক চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরির বাংলা বিভাগে আপনার অনেকগুলি বই যে রয়েছে তা কি আপনি জানেন রবিবাবু? শেষের মন্তব্যটি এই—"আমি আজ ছুটো অবধি একটা গল্প লিখে '—' কে পাঠালাম। লিখে লিখে হাত ব্যথা হয়ে গেছে, তাই আমার লেখা এত

খারাপ হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না।" বিলিতি সাহেব-মেমসাহেবদের নিয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা আনন্দ অবলম্বনে পরবর্তী-কালে কয়েকটি অতি প্রসিদ্ধ বাংলা গল্প লিখেছিলেন তিনি—সেই বিদেশী চরিত্রগুলির পর্যবেক্ষণের সূচনাও হলো এই সময়ে। শুধুই কি গল্প ? প্রস্তুতি চলে নতুন উপন্যাস লেখারও। মাসিক পত্রটিতে ধারাবাহিক ভাবে বার হবে। তরুণী সম্পাদিকার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে প্রায় পর পর দুটি ধারাবাহিক লেখা দিয়েছিলেন, 'চিরকুমার সভা' ও 'নষ্টনীড়'। ও দুটি শেষ হবার পর তখুনি তখুনি আবার আরেকটি ধারাবাহিক লিখতে রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক। তাছাড়া তিনি তখন বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)-এর সম্পাদক। এবার তরুণী সম্পাদিকা বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে পর পর চিঠি পাঠালেন বিলেতে নবীন লেখকের কাছে। নবীন লেখক লিখলেন উপন্যাস 'রমা-সুন্দরী'। এটি যে উঁচুদরের উপন্যাস তা বলা যাবে না। কিন্তু নিরাভরণ চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে প্রসাদগুণ এর এতোই বেশি যে, ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে 'রমাসুন্দরী' অসংখ্য পাঠকের নজর কেড়ে নেয়। শুধু নিজের লেখা পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, 'মাসিক-পত্র'টির ওপর তাঁর মনের টান কতোখানি ছিলো বোঝা যায় যখন দেখি রমেশচন্দ্র দত্তের কয়েকটি সদ্য রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ তিনি পাঠাচ্ছেন। পাছে কোনো গোলমাল থাকে, এজন্য অনুবাদের পর পাণ্ডুলিপি স্বয়ং রমেশ-চন্দ্রকে পড়িয়ে এবং শেষ পাতায় সই করিয়ে নিতেও তাঁর ভুল হতো না।

যথাসময়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে এলেন দেশে। সময়টা ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর। পরিচয়গুলো এবার পর পর দিয়ে দিই।

নবীন সাহিত্যিক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ খৃঃ—১৯৩২ খৃঃ), বিদুষী তরুণী—ভারতী মাসিক-পত্র-সম্পাদিকা সরলা দেবী (১৮৭৩ খৃঃ—১৯৪৫ খৃঃ)। তাঁর কুমারী পদবী ঘোষাল। মায়ের নাম স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল)। অর্থাৎ সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী।

এবার নির্ঘাত প্রশ্নটি মনে জাগে—প্রভাতকুমার ও সরলা দেবীর বিবাহ হয়েছিলো কি ?

—না।

প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসবার পর প্রায় দু বছর ধরে বিবাহ হচ্ছে-হবে কানাঘুষো এগোলেও শেষে পাকাপাকি জানা গেলো, এ বিয়ে হবে না।

প্রভাতকুমার এবং সরলা দেবীর পারস্পরিক আকর্ষণ, অনুরাগ, বিবাহপ্রস্তাব ও সেই ঘটনার সূত্রে প্রভাতকুমারের বিলেত গমন— পুরো ব্যাপারটাই সীমাবদ্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ স্বজন ও বন্ধুমহলে। ব্যক্তি-গত খবরাখবর নিয়ে যাতে বাইরে কেউ মাতামাতি না করে, ঘটনাটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপলক্ষ্য না হয়, সে প্রশ্নে এঁরা সবাই সচেতন ছিলেন। বাইরে তাই বিশেষ কোনো খবর ছড়ায়নি। কিন্তু অতোদূর এগিয়ে এমন নিশ্চিত বিবাহ ভেস্তে যাওয়ার সংবাদ, এমন কি একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু মহলেরও কারু কারু কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে।

বিয়ে না হবার কি কারণ ছিলো, সে সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। অনেকেই এ সম্বন্ধে নানা অভিমত দিয়েছেন। সব চেয়ে সম্ভাব্য, গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধিক প্রচলিত অভিমত হলো এই—প্রভাত-কুমারের মা এ বিয়েতে একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন কি এই বিয়ে হলে তিনি জলস্পর্শ না করে প্রাণ বিসর্জন দেবেন সে দৃঢ় সিদ্ধান্তও জানিয়ে দেন। বহু অনুনয়-বিনয়ে মাকে রাজী করাতে না পেরে প্রভাত-কুমার নতমস্তকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কর্তাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন।

মাকে খুব ভালোবাসতেন তো, মার মনে নিদারুণ আঘাত দিতে চাননি, বরং দুঃসহ মানসিক দুঃখ নীরবে বরণ করে নেওয়াই সেদিন তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিলো।

এ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতেও উজ্জ্বল সংবাদ একটি রয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং গোটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে প্রভাতকুমারের মধুর হৃদ্য সম্পর্ক এ তিক্ত ঘটনায় কিন্তু চিড় খায়নি।

প্রভাতকুমার এভাবে পিছিয়ে আসায় এঁরা গোড়ায় বেশ ক্ষুণ্ণ হন

তা বলা বাহুল্য। কিন্তু ওঁর মার প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে জটিল পারিবারিক সমস্যাও তো উড়িয়ে দেবার নয়। ওঁর নিরুপায় অবস্থা বুঝে নিতে এঁদের দেরি হয়নি। সম্পর্ক অটুট মধুর ছিলো চিরদিন। প্রভাতকুমার বরাবর এঁদের গভীর শ্রদ্ধা করতেন, বিনিময়ে পেয়েছিলেন পরমাত্মীয়ের স্নেহ ও সহানুভূতি। তাঁর সাহিত্যজীবন এঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহে অভিষিক্ত ছিলো।

ঐ বিবাহপ্রস্তাব যখন চূড়ান্তভাবে ভেঙে গেলো তখন সরলা দেবীর বয়েস ৩৩। যদি অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি হন তাহলে আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। অভিভাবকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন আবার। ঠিক এই সময়েই সৌভাগ্যক্রমে এক অতি সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী যুবক রামভজ দত্ত চৌধুরী। বয়েস ৪০। অত্যন্ত সুদর্শন। টকটকে ফর্সা রং, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ গড়ন, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী—যাকে বলে রাজপুত্রের মতো চেহারা। উচ্চশিক্ষিত, রুচিসংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঠাকুর পরিবারের প্রতি এঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—তাছাড়া পাঞ্জাব ও বঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যে যাতে একটা বন্ধন গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে উৎসাহী। সরলাকে বিয়ে করতে তিনি খুব আগ্রহ দেখান।

আত্মীয়পরিজন সকলেই সরলা দেবীকে এ বিয়েতে রাজি হবার জন্য অনুরোধ করেন। সরলা দেবীর মা ও বাবা (স্বর্ণকুমারী দেবী, জানকীনাথ ঘোষাল) তখন বৈদ্যনাথে। তাঁরা মেয়ের কাছে রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহে তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছের কথা জানালেন পত্র মারফৎ।

সরলা দেবী চিন্তা করবার জন্য কয়েকদিন সময় নিলেন। এই সময়ের ফাঁকে তিনি চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে খোঁজখবর নেন। ঐ ব্যক্তিরা চৌধুরী মহাশয়কে চিনতেন জানতেন। এঁদের মুখে এক বাক্যে প্রশংসা শুনে সরলা দেবী আর বিয়েতে আপত্তি করলেন না। বৈদ্যনাথ স্টেশনে নেমে দেখলেন তাঁকে বধূবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুসজ্জিত পালকি দাঁড়িয়ে। আর সুন্দর সুন্দর পোশাক ও অন্যান্য আভরণ নিয়ে অপেক্ষা করছেন পরিবারের আত্মীয় মহিলারা। বৈদ্যনাথে

তুজনের বিয়ে হয়ে গেলো মহাসমারোহে। দিনটা ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৫ অক্টোবর।

এর পর সরলা দেবী স্বামীর সঙ্গে লাহোর চলে যান। তু বছর পরে তাঁদের একমাত্র সন্তান দীপক জন্মগ্রহণ করে।

রামভজ দত্ত চৌধুরী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রেমপ্রীতি পেয়েছেনও অনেক। এঁদের দাম্পত্যজীবন মোটামুটি সুখেই কেটেছে। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করলাম এই কারণে যে, পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর থাকলেও, রাজনীতি-আদর্শগত প্রশ্নে শেষপর্বে তুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা মতভেদের সৃষ্টি হয়। সরলা দেবী প্রথম জীবনে রাজনীতি প্রশ্নে ছিলেন চরমপন্থী। বিয়ের পরে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে অসহযোগ আদর্শে বিশ্বাসী হন। স্বামী কিন্তু আগা-গোড়াই ছিলেন চরমপন্থী। তাই সরলা দেবীর মত পরিবর্তনে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ১৯১৯ খৃঃ নাগাদ তুজনের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ। অবশ্য চৌধুরী মহাশয় স্ত্রীর সংকল্পে হস্তক্ষেপ করেননি কোনোদিন। বেশ কিছুকাল তুজন দূরে দূরে কাটাবার পর চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, খবর পাওয়া মাত্র তখনি স্বামীর কাছে ছুটে এলেন সরলা। আবার তুজনের মিল হয়ে গেলো, কিন্তু হায়। বেশি দিনের জন্য নয়। স্বামীর সেই শয্যা ছিলো—শেষ শয্যা।

সরলা দেবী সম্বন্ধে আরো তু'চার কথা যোগ করা যেতে পারে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে লাহোর চলে গেলেও সেখানে থেকেই বছর দেড়েক 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। যাবতীয় লেখা প্রাথমিক নির্বাচনের পর তাঁর কাছে যেত। তিনি আবার দেখেশুনে ডাক মারফৎ ফেরত পাঠাতেন। অনুরোধ, নির্দেশ, সংশোধন সম্পর্কে মতামত, সবই জানাতেন চিঠিপত্রে। অবশ্য ১৯০৭ খৃস্টাব্দের পর নানান কাজের চাপে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। 'ভারতী'র ভার নেন নতুন সম্পাদক।

১৯২৩ খৃস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সরলা দেবী দীর্ঘ ১৮ বছর বাদে কলকাতায় পাকাপাকি বসবাসের জন্য ফিরে এলেন। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ফের হাল ধরলেন 'ভারতী'র। ততোদিনে মাসিক-পত্রটি দীর্ঘপঙ্ক

পার হয়ে পৌঁছেছে ৪৮ বছরে। তবে 'ভারতী'র তখন একেবারে ভাঙা-চোরা যায়-যায় অবস্থা। যেমন বাজে কাগজ, তেমনি ভুল ছাপা আর নিম্নমানের লেখায় ভর্তি। নেহাৎ হতশ্রী মলিন ঐ মাসিক পত্রকে দেখে ওর গৌরবোজ্জ্বল অতীত যেন কল্পনা করা চলে না।

বাংলা মাসিক পত্ররূপে তখন সব চেয়ে ইজ্জত 'প্রবাসী'র। তারপর 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'মাসিক বসুমতী'। অনেক পেছিয়ে 'ভারতী'। সরলা দেবীর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণে কারো কারো মনে আশা জাগে যে আবার হয়তো ফিরে আসবে সুদিন। কিন্তু সে আশা ক্রমেই মিলিয়ে গেল। পত্রিকাটির শেষ পর্যায়ে দু বছর পাঁচ মাস সরলা দেবী চালান। এবং তারপরই 'ভারতী' উঠে যায়। এই সময়টুকুর ফাঁকে 'ভারতী'র ঔজ্জ্বল্য তিনি একটুও উদ্ধার করতে পারেন নি। নেমে আসা স্ট্যাণ্ডার্ডকে এমন কিছু তুলতে পারেন নি যাতে গ্রাহক কিম্বা পাঠকের মন নতুন করে 'ভারতী'র প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আসলে সরলা দেবী তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃশেষিত শক্তি। তাছাড়া তাঁর যৌবনকালের সম্পাদকজীবনের যে দুজন ছিলেন সব চেয়ে বেশি সহায়ক, তাঁরা কেউ নেই ওঁর পাশে। রবীন্দ্রনাথ তখন 'ভারতী'র প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। লেখা দেন না। আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে সরলার বিয়ের কয়েকমাস আগে থেকেই। সেই দীর্ঘকালের বন্ধ দুয়ার খুলে লেখা চাওয়া বা পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। 'ভারতী'র মৃত্যু ঠেকানো তাই সরলা দেবীর তখন অসাধ্য ছিল।

লেখিকারূপে সরলা দেবী কতোটা শক্তিময়ী? মাত্র ১২ বছর বয়সে ওঁর 'ভারতী'র পাতায় হাতেখড়ি। পরবর্তী একটানা দীর্ঘকাল, এমন কি লাহোরে থাকাকালীন পর্যন্ত, বাংলাভাষা চর্চা তিনি বন্ধ করেন নি। সম্পাদনা ছাড়লেও লেখা পাঠাতেন প্রায় নিয়মিত। কবিতা গান থেকে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ থেকে ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা নানান বিষয়ে এবং প্রসঙ্গে তিনি কলম ধরেন। অধিকাংশ রচনা তাঁর 'ভারতী'তে হলেও অন্য সাময়িক পত্রেও লিখেছেন। ১৮০টির কিছু বেশি ছোট বড় লেখা

তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যিক খ্যাতি বা মর্যাদা কখনো পাননি। পাওয়ার সম্ভাবনাই বা কোথায়? তাঁর লেখায় যে যে দোষের কথা আগে বলে নিয়েছি, এ ছাড়াও তাঁর রচনাভঙ্গির মধ্যে উচ্ছ্বাসের অতি প্রাবল্য লেখাকে আরো কমজোরি করেছে। দুর্বল এবং এলো-মেলো। আর নানান তাৎক্ষণিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিম্বা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে উত্তেজক লেখা সমসাময়িক প্রচুর হাততালি পেলেও তো কিছুদিন পরে এমনিই মূল্যহীন হয়ে যায়।

লেখিকারূপে প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় তাঁর মনে একটা চাপা বেদনা-বোধ বরাবর ছিল। শেষ বয়সে লেখা আত্মস্মৃতিতে তিনি মন্তব্য করেন, "আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপা-সুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনা এডিশনে ছাপানো 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাসমিতিতে ভাষিত ইংরেজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, বঙ্গের বীর সিরিজের দুখানা পুস্তিকা ছাড়া…।"

লেখিকারূপে সফলতা না পেলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। সর্বভারতীয় খ্যাতি। সাংগঠনিক কাজে তাঁর দক্ষতা বরাবর। জনসংযোগেরও ক্ষমতা ছিল। ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। লাহোরে যাবার পর থেকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্বামীর সঙ্গে একটি উর্দু রাজনীতিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ভারতের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে। গান্ধীজীর স্নেহ ও বিশ্বাস পেয়েছিলেন যথেষ্ট।

বাংলাদেশে ফিরে এসেও ওঁর কর্মপ্রচেষ্টা থামেনি। স্বাদেশিকতার বাণী প্রচারে এবং দেশের যুবশক্তি সংগঠনে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার কথা সকলেরই জানা। সরলা দেবী চৌধুরাণী নামেই তিনি পরিচিতা।

আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়? তিনি আর বিয়ে করেন নি। একলাই জীবন কাটিয়ে গেছেন।

অতো কাণ্ড করে যে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি—সেটিরও তেমন ব্যবহার

করেননি। ব্যারিস্টারি ব্যবসা যে কিছুকাল চালাননি এমন কথা নয়, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে তাঁর আদৌ মন ছিলো না। সাহিত্যের কমল মধুর আস্বাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকে নিছক টাকা উপার্জন করার পেশায় কতোদিনই বা আটকে রাখা যায়! নিজেকে পুরোপুরি সাহিত্যসেবায় নিমজ্জিত করে দিলেন তিনি। সাহিত্যই হলো তাঁর নেশা এবং পেশা। ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা ছাড়া প্রখ্যাত মাসিকপত্র 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনা করেছেন একটানা প্রায় ১৪ বছর এবং তাঁর সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্মবাণী' বহুল প্রচারিত ও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সাময়িক পত্রে পরিগণিত হয়। জীবনের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেও তা তাঁর মূল জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে বেশ খানিকটা প্রক্ষিপ্তই ছিলো বলা উচিত।

সাহিত্যের মাধ্যমে একদা তিনি যে কি বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তা নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'নবকথা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। পাঠকের তারিফও পেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর অনবদ্য গল্প সংকলন 'ষোড়শী'র মধ্য দিয়ে জয়যাত্রা শুরু। এরপর ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত গল্প সংকলন 'দেশী ও বিলাতী'তে তিনি বাঙালী পাঠককে পুরো জিতে নিলেন। একে একে প্রকাশিত হতে থাকলো তাঁর অন্যান্য অপূর্ব গল্পসংকলন 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি' 'পত্রপুষ্প' 'গহনার বাক্স'। যেমন গল্প বোনার কায়দা, তেমনি যে পরিমিতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা আজও আমাদের আশ্চর্য করে। চরিত্রগুলি আঁকতেন খুব স্বাভাবিক রক্তমাংসের মানুষের ছাঁচে। এবং গল্পের নারী ও পুরুষের মুখে জ্যান্ত সংলাপ কেমনভাবে দিতে হয় তা তাঁর নখদর্পণে ছিল। তাঁর উপন্যাস 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'জীবনের মূল্য' 'সিন্দূর কৌটা' জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর ছোট গল্পের জনপ্রিয়তা ছিলো ঢের ঢের বেশি। একটানা ১৪ বছর রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই ছিলো তাঁর স্থান। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র আপন প্রতিভায় প্রভাতকুমারকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করে নেন।

একটা কথা প্রায়ই ভাবি। 'সচ্চরিত্র', 'লেডি ডাক্তার', 'হীরালাল' ইত্যাদি দু-চারটি নিষ্ঠুর গল্প বাদ দিলে প্রভাতকুমারের অধিকাংশ রচনাই হাস্যরসোজ্জ্বল। মজার চরিত্র, কৌতুক টইটুম্বুরে পরিস্থিতির বিন্যাস ও অতি সরস সংলাপ-ই তাঁর প্রধান বিশেষত্ব। লেখাগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর নির্মল প্রসন্ন চাপা হাসি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পড়বার পর পাঠকের মন স্নিগ্ধরসে ভরে ওঠে। এছাড়া গল্পে দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা যেখানে এসেছে, তখন যেন প্রভাতকুমারের কলমে উপচে পড়েছে মাধুর্য, ভালোবাসা।

ব্যক্তিগত জীবনে এতোখানি যে বেদনা পেলেন, কাটালেন নিঃসঙ্গ জীবন—কই সেই দুঃসহ বেদনার ছায়াপাতও দেখা গেলো না কেন তাঁর রচনায়?

তবে কি প্রভাতকুমার হৃদয়ের নিভৃতে রক্তাক্ত গভীর গোপন বেদনার কাঁটা, হাসির উচ্ছ্বাসের আবরণের আড়ালেই লুকিয়ে রেখে গেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব কেউ কোনোদিন জানবে না।

টাউন হল সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ

ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ, মঙ্গলবার সন্ধ্যে প্রায় পোনে সাতটা। বাতাসে শীতের হিমেল আমেজ। উত্তর কলকাতার অধুনা গিরিশ পার্কের পিছন দিকে বারানসী ঘোষ স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের প্রায় সংযোগস্থলে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির সদর দরজায় ঝকঝকে ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। এসেছেন ও আসছেন বহু গণ্যমান্য লোক। পায়ে হেঁটে এসেছেনও কেউ কেউ। রীতিমতো গমগমে পরিবেশ। দেউড়িতে মশালচি-র মশালের আগুনে পথ আলোকিত—ঐ পথের নামকরণ তখনো হয়নি—সবাই বলে জোড়াসাঁকো, সিঙ্গীবাড়ির সামনে! অসংখ্য রেড়ির তেলের প্রদীপে চমৎকার সাজানো হয়েছে প্রকাণ্ড বাড়িটি। কেরোসিন তেল তখন সবে আমদানী শহরে। নেহাৎ সাহেব ও দেশীয় বড়লোকদের বাড়িতেই কেরোসিন তেলের বাতি নজরে পড়ে। সাধারণ লোক তো

ঐ আশ্চর্য তেলের বাতির জেল্লায় একেবারে থ! তা সেই কেরোসিন তেলের-ও অনেকগুলি বাতির ব্যবস্থা হয়েছে বৈকি। তবে আলোর উজ্জ্বলতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মনীষায় উজ্জ্বল গণ্যমান্য বিদগ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতি। নেই কে? কিশোরীচাঁদ মিত্র থেকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। সাহিত্যে উৎসাহী বহু সাধারণ মানুষও এসেছেন: বিরাট হলঘর ভর্তি। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় আলোয় পূর্ণিমা।

সাতটা বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাঁকে ঘিরে এই উৎসব এবং উৎসুক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের সমাবেশ—সেই তিনি এসে পৌঁছোলেন।

নিখুঁত ইয়োরোপীয় পোশাক ও আদব-কায়দায় এক দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ভারতীয়। উচ্চতা মধ্যমের চেয়ে একটুখানি বেশি। ঈষৎ স্থূলকায়। কৃষ্ণবর্ণ। পুরু দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠ। আয়ত চোখ, মাথায় কালো ঝাঁকড়া চুল মধ্যে সিঁথি করে আঁচড়ানো, প্রকাণ্ড জুলফি গাল অবধি নেমেছে। সুদর্শন নন মোটেই কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত সেই আকৃতির দিকে বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

উদ্যোক্তারা পরম সমাদরে ওঁকে নিয়ে হলঘরে বসালেন। উদ্যোক্তাদের প্রধান ঐ প্রকাণ্ড বাড়ির মালিক, টকটকে ফর্সা সুদর্শন ২১ বছরের তরুণ। সাহিত্য প্রসারে অপরিসীম আগ্রহ এই তরুণ জমিদারের। নিজেও তিনি খুব গুণী। তাঁরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র। এই সভায় আজ সন্ধ্যায় সম্বর্ধিত হবেন কৃষ্ণবর্ণ, কোট-প্যান্টধারী আগন্তুক।

সাহিত্য অনুরাগী তরুণ সভার তরফে মানপত্র পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। চমৎকার লেখা—একটুখানি উদ্ধৃত করি। "আপনি বাঙলা ভাষায় যে অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে। এমন কি, আমরা পূর্বে স্বপ্নেও বিবেচনা করি নাই যে কালে বাঙলা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙলা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আপনি বাঙলা ভাষাকে অপূর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙলা ভাষায় আবিষ্কৃত

হইল—এজন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, আপনার সহবাস লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইলাম, হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময়ে বর্তমান না থাকুন, বাঙলা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন আমরা আপনার সহবাসসুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই··· ।”

বোধ হয় আর বলে দেওয়ার কিছু দরকার করে না যে, সম্বর্ধিত কবি স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং উদ্যোক্তা সেই তরুণ সাহিত্যরসিক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। সময় ১৮৬১ খৃস্টাব্দ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের এক সেবককে দেশবাসীর তরফ থেকে যথা-যোগ্য মর্যাদায় অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করা হলো। মানপত্রে উল্লেখিত মদ্যপান করার পাত্রটি ইটালিয়ান ধাঁচে রুপোর তৈরি। যাকে বলে ক্ল্যারেট জাগ্‌। ভারী আকারের। গায়ে অতি সুন্দর কারুকার্য। সকলের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত রূপোর পানপাত্রটির সত্যি-কারের দাম কোটি টাকারও বেশি। কৃতজ্ঞ দেশবাসীর দেয়া ঐ পুরস্কারের মাধ্যমে মাইকেলের শিরে পরানো হলো সম্রাটের মুকুট।

সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা দেয়ার এই মহৎ প্রচেষ্টা কিন্তু পরবর্তী ৫০ বছর পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গ স্বর্ণপ্রসবিনী। কতো মনস্বী মনীষীর অবির্ভাব এবং পূর্ণ প্রভায় প্রকাশ বাঙালীর চোখ দিয়েছে ধাঁধিয়ে। অনেকেরই নাম মনে আসে—কিন্তু এঁদের মধ্যে সব চেয়ে আগে যে দুজন, তাঁরা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র।

কিন্তু অন্তত এঁদের দুজনকেও, সম্বর্ধনা দিতে এগিয়ে আসেন নি

সেদিন দেশবাসী। বঙ্কিমচন্দ্রের তো কথাই ওঠেনি, বিদ্যাসাগর মশাইকে সোনার দোয়াত কলম দিয়ে সম্বর্ধনা দেয়ার প্রস্তাব বেশ কয়েক বছর ধরে হচ্ছে হবে করে শেষে ভণ্ডুল হয়ে গেলো। টাকা পয়সা কিংবা হৃদয়বান রসজ্ঞ সমঝদার ব্যক্তির অভাব ঘটেছিলো এমন তো নয়। বদখেয়ালে যেমন অজস্র টাকা উড়েছে তেমনি সৎকাজেও সেদিনকার বাঙালী টাকা দিয়েছেন অজস্র। এবং কোনো কিছুর ধান্দা বা পরোয়া না করেই দিয়েছেন। টাকার কথা ছেড়েই দি—বহু মহৎ কাজে সহায়তার জন্য বুক দিয়ে দাঁড়াতেও তো দ্বিধাবোধ করেন নি তাঁরা। তাহলে এই দুই মহান্ সাহিত্যিককে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্বর্ধিত করার মাধ্যমে তাঁরা তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নীরবতা পালন করলেন কেন?

উপযুক্ত চেতনার অভাব—তাছাড়া আর কি বলা যায়। একক ভাবে হয়তো কথাটা ভেবেছেন অনেকে, কিন্তু সংগঠিত না হওয়ায় সে প্রচেষ্টা দানা বাঁধেনি।

সাহিত্যিক সম্বর্ধনায় দেশবাসীর অনীহা সম্বন্ধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ঈষৎ বিষণ্ণ কণ্ঠের আভাস মাইকেলকে দেয়া মানপত্রের মধ্যে শোনা গিয়েছিলো। আরো স্পষ্ট খোলাখুলি মন্তব্য তিনি করলেন পরের বছর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রে। একটুখানি উদ্ধৃত করি। "হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয়বস্তুর নিয়ত সহবাস নিরঞ্জন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে কত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না…।"

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে—শুধু মাইকেল কেন—অন্যান্য মহৎ সাহিত্যিকের সম্বর্ধনায় দেশবাসীর নিরুৎসাহের অন্যতম প্রধান কারণ।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই, গুণগ্রাহী মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খৃঃ) চলে গিয়েছিলেন মাত্র ৩০ বছর বয়সে, বাঙালীর

জীবনে তথা বঙ্গভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের সে ক্ষতিপূরণ হয়নি কখনো।

আগেই বলেছি, মাইকেলকে সম্বর্ধনা দেয়ার ৫০ বছরের মধ্যে আর কোনো সাহিত্যসেবককে মনে পড়েনি বঙ্গদেশবাসীর। কথাটা খানিক ঘুরিয়ে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই,—জোড়াসাঁকোর সিংহীবাড়ীর বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল যে বছর সম্বর্ধিত হন—ঠিক সেই বছর—তিন মাস পরেই, মাত্র কয়েকখানি বাড়ির তফাতে ঠাকুর পরিবারে জন্ম নিলেন এক জ্যোতির্ময় শিশু। বিধাতার মুখে নিশ্চয় সেদিন এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিলো। পরবর্তী দ্বিতীয় সম্বর্ধনা নির্দিষ্ট হলো শুধু এই নবজাতকের জন্যই। এবং দেশবাসী অপেক্ষা করে রইলেন ৫০ বছর!

জ্যোতির্ময় রবির জয়রথ শুরু থেকেই অভ্রান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। পথ বন্ধুর। রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁর সাহিত্যআদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করতে অসংখ্য লোক দীর্ঘসময় ধরে একটানা নির্মম আক্রমণ চালিয়ে যান। তবু তাঁকে রোখা কারুর সাধ্যে কুলোলো না। অবশ্য অজস্র নিন্দা ঈর্ষা ও কুৎসার প্রবল বাধা যেমন তাঁর পথ রুদ্ধ করতে এলো, তেমনি সেই সঙ্গে রসজ্ঞ পাঠকের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেতেও যে তাঁর দেরি হয় নি সে কথাটি ভুলে গেলে চলবে না।

২০, ২১ এবং ২২ বছর বয়সে পর পর তিনবার সাহিত্যসাধনায় তিনি স্বীকৃতি পেলেন খ্যাত সমালোচক এবং স্রষ্টার কাছ থেকে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০ খৃঃ) সে-যুগের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার। উঁচুমানের মাসিক পত্র 'বান্ধব' সম্পাদক। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গদর্শন'-এর শেষ সংখ্যায় লেখা এডিটোরিয়ালে 'বান্ধব' মাসিক পত্রের সপ্রশংস উল্লেখ করেন। কালী-প্রসন্ন ঘোষ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। "পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর" বিশেষণে তাঁকে একডাকে সবাই চিনতো। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' মাসিক পত্রে তিনি লিখলেন—"বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব

আছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। আমাদিগের বোধ হয় বাংলায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।" এই মন্তব্যের দু বছর আগে ঐ একই মাসিক পত্রে 'কবি কাহিনী'র-ও যথেষ্ট অনুকূল সমালোচনা করেছিলেন তিনি—"যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গলা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে..., যে কবিতা শিশিরসিক্ত কমলকলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্যহৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে, যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই 'কবি কাহিনীর' প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে..., বাঙ্গলা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ!"

পরের বছর, ১৮৮১ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আদায় করে নিলেন স্বয়ং সাহিত্যসম্রাটের কণ্ঠের মালা। অসামান্য ঐ ঘটনাটি আমরা অনেকেই জানি। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের বড়ো মেয়ে কমলার বিয়েতে তাঁর ২০ নম্বর বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। মহামান্য অতিথিকে দেখে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে রমেশচন্দ্র ছুটে এলেন। কিন্তু সেই মালা রমেশচন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে সাহিত্যসম্রাট তাঁর কাছে দাঁড়ানো তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে। তারপর রমেশচন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?"

তৃতীয় স্বীকৃতি এলো তার পরের বছর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় "এডুকেশন গেজেট"-এ 'প্রভাতসংগীতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তরুণ রবিকে 'প্রকৃত আর্যকবি' আখ্যা দিলেন। তিনি লিখলেন, "রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত আর্যকবি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আর্যকবি বলিলাম এইজন্য যে, তাঁহার হৃদয় প্রকৃতি-শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে, যাহা প্রাচীন আর্য-

কবিদিগেরই করিত।” উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভরা প্রবন্ধটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় শেষ করলেন এইভাবে, “এতদিনের পর বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ রবীন্দ্রবাবুর কবিতাতে দেখিতে পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। তিনি ‘মহাস্বপ্ন’ কবিতায় লিখিয়াছেন, “কভু কি আসিবে দেব/সেই মহাস্বপ্নভাঙা দিন/সত্যের সমুদ্র মাঝে/‘আধ’সত্য হয়ে যাবে লীন?” —যাহাকে এই আধসত্য বলা হইল ইহারই বৈদান্তিক নাম ‘মায়া’। এই ‘মায়া’ লইয়া কতই তর্ক বিতর্ক, কতই গোলমাল, কতই রূপক রচনার ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে ইউরোপীয় দার্শনিক বার্কলি হইতে উহার টিপ্পনী বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবি একটিমাত্র কথায় সমুদয় অন্ধকার ভেদ করিয়া, সমুদয় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। আর ইংরাজীনবিসের কাছে বার্কলির গ্রন্থ হইতে ‘মায়াবাদ’ শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। ‘মায়া’-র অর্থ ‘খণ্ড-জ্ঞান’ বা ‘আধসত্য’।”

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন চলে গেলেন তখন তাঁর পরিত্যক্ত রাজসিংহাসনের সব চেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ৩৩ বছরের রবীন্দ্রনাথ।

অবশ্য ‘মহাকবি’ আখ্যায় ভূষিত এবং মাইকেলের শূন্য আসনে বঙ্কিম যাঁকে বসিয়েছিলেন—সেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনো আছেন, পাঠক-সংখ্যা তখনো তাঁর প্রচুর এবং লিখছেনও যথেষ্ট। মুশকিল হলো, তাঁর পাঠকসংখ্যা যা আছে তো আছে, কিন্তু বাড়ছে না মোটেই। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য নব্যশিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীমহলে জাগিয়ে তুলেছে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা, রুচি-ই বদলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত গতিতে।

অপর যে দুজন এই সময়ে ‘মহাকবি’ আখ্যায় ভূষিত ছিলেন, তাঁরা নবীনচন্দ্র সেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ভক্ত পাঠক সংখ্যা এঁদেরও অনেক। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের পক্ষে ও বিপক্ষে, দোষ ও গুণ বিশ্লেষণে এবং প্রশস্তি-নিন্দায় তখন বাংলাসাহিত্যে সব চেয়ে বেশি আলোড়ন বা ঝড় উঠেছে।

বিংশ শতাব্দী শুরুর তিন বছর বাকি থাকতেই রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'কবিসম্রাট' বিশেষণটি খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে দু-এক জায়গায় ব্যবহার হতে শুরু হয়। আরো কয়েকটি বছর পার হলো। রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বীকৃতি বাড়ছে ক্রমেই। তারিফের মাত্রাটা কোথায় গিয়ে থামা উচিত, সে বিষয়েও বিভ্রান্তি নেহাৎ কম না। কোনো কোনো দিশেহারা সমালোচককে এহেন মন্তব্য করতেও দেখা যায় যে, 'ভারতচন্দ্রের পর' কিংবা 'চণ্ডীদাসের কথা বাদ দিলে'—'এইরূপ' কবি নাকি আর বাংলাভাষায় দেখা যায় নি। অবশ্য 'রবিবাবু মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন নহেন' কিন্তু 'তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাহা কে অস্বীকার করিবে?' কিম্বা 'বঙ্গসাহিত্য সংসারে রবিবাবুর স্থান কোথায় তাহা নির্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। আমরা তাহা করিতেও চাহি না। কিন্তু এ কথা বলিব যে, তিনি জননী বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বলরত্নে ভূষিত করিতে নিয়ত প্রযত্ন করিতেছেন।'

১৯১০ খৃস্টাব্দ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় প্রভায় বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা উদ্ভাসিত। এমন কি তাঁর দুর্দান্ত ৭৬টি ছোট গল্পের অধিকাংশই লেখা হয়ে গিয়েছে। এই পটভূমিতেই রবীন্দ্র-অনুরাগীরা স্থির করলেন, ওঁর ৫১ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক মহতী সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করতে হবে।

মুখে মুখেই কথাটা প্রথমে চাউর হতে আরম্ভ করে। এবং শুনে অনেকেরই চোখ কপালে উঠে গেলো। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা কেন দেয়া হবে না, এই প্রশ্নে এযুগে আমরা যতোখানি বিস্মিত—সম্বর্ধনা দেয়াটা হবেই বা কেন, এই প্রশ্নে বিস্মিত হবার মতো লোক সেযুগে অনেক বেশিই ছিলেন।

রবীন্দ্র-বিরোধীদের বক্তব্য আমরা একটু পরে আলোচনা করবো। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুরাগীরাও একটা ব্যাপারে কিছু মুশকিলে পড়েছিলেন, সে কথাটা আগে বলে নিই। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বেশ কিছু সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও তখন আছেন। যদিও এঁদের কারুর সঙ্গেই রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো তুলনাই হয় না, এবং সে তুলনা কেউ করেও নি—

সেকথা ঠিক। কিন্তু বয়সে বড়ো বলে কথা! এ দের একেবারে টপকে যাওয়াটা কেমন কেমন লাগে। এঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭), স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪—১৯১৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩৯) প্রমুখ।

কিন্তু স্বয়ং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন খুব উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা প্রস্তাব সমর্থন করে দুর্দান্ত মরাল সাপোর্ট এনে দিলেন তখন তো আর বলার কিছুই নেই। গুরুদাস নাকি সাফ বলেই দিয়েছিলেন যে, এই "অতিশয় সমীচীন প্রস্তাবে" কারুর যে কোনরকম আপত্তি থাকতে পারে—তাই তিনি ভেবে পাচ্ছেন না! "কবি সম্বর্ধনা" শিরো-নামে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে।

"আগামী ২৫শে বৈশাখ রবিবার কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্র-বাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সম্বর্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই। তাঁহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে

কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে কোনো স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদ-পত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

সমিতির সদস্যগণ—মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।"

বহুমুখী রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে (ফাল্গুন, ১৩১৮) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতো স্পষ্ট কথা এমন সাহসিকতার সঙ্গে ইতিপূর্বে কেউ বলতে পারেননি। আজকে ঐ বক্তব্য আমাদের কাছে পুরনো এবং সাদামাটা মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিন অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে এমন স্বচ্ছ ও সোজাসুজি বিবৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো। একটুখানি আমরা উদ্ধৃত করছি—"রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইহা সর্ববাদিসম্মত। তিনি যে জীবিত বাঙালী লেখকগণের মধ্যে প্রথম স্থানীয় ইহাও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর, পক্ষপাতশূন্য সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যাহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের, এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত এই যে তিনি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক-দিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে বিভাগে হাত দিয়াছেন, তাহাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন—তাহা তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিয়াছে। মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্মস্থলে পৌঁছিতে তাঁহার মত আর কোন বঙ্গীয় লেখক পারিয়াছেন? তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনাইয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনায় ও কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। তাঁহার হস্তে বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে সকল আদর্শ, ভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে উন্নতির জন্য, নব আলোকের জন্য, নব জীবনের জন্য, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার রচনার মধ্যে অনুভব করিতেছে। বাংলাভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন। তিনি ওস্তাদ না হইলেও সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। তিনি যে কেবল ভগবদ্‌-ভক্তি ও অন্যান্য নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়বীণার সহিত মিলাইয়া নানা ভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন তাহা নয়, তিনি নূতন গানে নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ বিশুদ্ধ সঙ্গীতদক্ষতা দ্বারা ওস্তাদদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে এবং সভাস্থলে লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। না লিখিয়া মুখে মুখে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বরচিত নাটকের তিনি যেরূপ অভিনয় করেন, তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ অভিনেতা বলিয়াই মনে হয়।...'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে', এ শিক্ষা তাঁহার মতো আর কে দিয়াছে? বাহিরের শৃঙ্খল যত দৃঢ় করিবার চেষ্টা হয়, আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সুষমা ও সংযত ভাব, তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক হাঁক আস্ফালনের বাক্যের বীরত্বোচ্ছ্বাসের অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে তন্মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্বের উপাদান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা আমাদের অনেক সময়ে এইরূপ মনে

হওয়া আরামদায়ক যে, আর কিছুতে না হউক, ইংরাজী বহি পড়া বিদ্যাতে এবং ইংরাজী রচনায় তিনি আমাদের সমকক্ষ নহেন। কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাইবার চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং পানও নাই এবং ইংরাজী লিখিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই বুঝা যায় যে, আমাদের মত বিদ্বৎখ্যাতিবিশিষ্ট বহু ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি বহি পড়িয়াছেন ও পড়েন। অনেকে শুধুই পড়েন, কিন্তু তিনি যত পড়েন, তদপেক্ষা চিন্তা করেন অধিক। আর এম-এ পাশ করা খুব বেশি লোকেই যে তাঁহার চেয়ে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারেন তাহাও তো দেখিতেছি না…।"

সম্বর্ধনা ভণ্ডুল করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা মূল যে আপত্তিগুলি একে একে তুলে ধরে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তা হলো—নজীরবিহীন এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ঘোরতর অন্যায়। এবং নির্লজ্জ তোষামোদের ভঙ্গি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে। রবিবাবু কি সম্বর্ধনা পাওয়ার আদৌ যোগ্য? না, যোগ্য নন; ওঁর জনপ্রিয়তা একটা হুজুগ মাত্র—রবীন্দ্রসাহিত্য টিকতেই পারে না। এবং কিছু বড়োলোকের ড্রইংরুম ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্য আর ১০/১৫ বছরের মধ্যে হাওয়া হয়ে যাবে। আচ্ছা না হয় মেনে নিলাম, রবিবাবু সুলেখক হতে পারেন, কিন্তু অতীতে বাংলার মহামনীষীদের যেখানে সম্বর্ধনা দেয়া হয়নি, সেখানে তাঁদের একেবারে ভুলে গিয়ে রবিবাবুকে নিয়ে এরকম নাচানাচি কি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নয়?

এঁরা আরো বললেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে একটি ছোট সংস্থা সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। সেই সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন, সেকথা ঠিক। কিন্তু পুরোটাই ছিলো একটি ঘরোয়া ক্লাব ধরনের সংস্থা আয়োজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তার পরিবেশ ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। সেইভাবে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার আয়োজন করা হলে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ ভালো কথাই তো। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে—দেশবাসীর নামে এবং যে আড়ম্বরে এ সম্বর্ধনা হতে যাচ্ছে তা অসহ্য।

এমন কথাও শোনা গেল, সম্বর্ধনা পাওয়ার লোভে রবিবাবু নিজেই ভেতরে ভেতরে কলকাঠি নাড়ছেন। সমস্ত পরিকল্পনাটাই তাঁর। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোকা বুঝিয়ে তিনি শিখণ্ডি খাড়া করেছেন।

হ্যাণ্ডবিল বিলি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ী গিয়ে ধর্না, ছোট ছোট সভা বা বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে সম্বর্ধনা-বিরোধীরা পরিস্থিতি রাতিমতো জটিল করে তুললেন।

ব্যাপার এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। উদ্যোক্তাদের কাছে কাতর মিনতি জানান তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর তীব্র মনোবেদনার প্রকাশ কি আশ্চর্য সুন্দর!

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন —আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা,

তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভার বহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবি সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার রূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম— আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি
২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন

যে, আপনাদিগকে আশু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে—অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি। আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি ২২শে বৈশাখ ১৩১৮।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্বর্ধনা উদ্যোক্তারা পড়লেন মহা মুশকিলে। কোনদিক সামলান? মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে। উত্তেজিত হলেই বিপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা —এমন কি, যে মহৎ কাজে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন, সেটিই পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাঁরা তাই খুব শান্ত মস্তিষ্কে এগোতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করালেন। সম্বর্ধনা-পণ্ডকারীদের সবিনয়ে জানালেন, যেহেতু অতীতে কর্তব্য পালন করা হয়নি, সেই কারণ দেখিয়ে পরবর্তীকালেও যুগ যুগ ধরে, সেই ভুলের, অন্যায়ের, চেতনহীনতার বোঝা টেনে নিয়ে যেতে হবে নাকি? বরং আজ রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ মর্যাদায় ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্বর্ধনা জানালে, অতীতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহা মনীষীকে জাতীয় সম্বর্ধনা না জানিয়ে

দেশবাসী যে নিদারুণ অন্যায় করেছিলেন, সেই অন্যায়ের বোঝা—সবটুকু না হোক—অনেকটাই লাঘব হবে। এছাড়া, সম্বর্ধনা-বিরোধী চাঁই ব্যক্তিদের কাছে অতি মোলায়েম ব্যক্তিগত পত্র লিখে এ অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বোঝাতে থাকেন তাঁরা। এমন কি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অনেক পরেও উদ্যোক্তাদের এ ধরনের চিঠি লিখতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রবিরোধী এক বিখ্যাত সাময়িক পত্র-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁর লেখা তিনখানি চিঠি ছাপেন। তার একটিতে রামেন্দ্র-সুন্দর খুব নম্র ভাষায় লিখছেন, রবীন্দ্রবাবুর ৫০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি মাত্র। কোনোরকম রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করিনি, কোনোরকম পদবী দিইনি বা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রবাবুর স্থান নির্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিনি। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান নিয়ে না হয় মতভেদ থাকলোই, কিন্তু তিনি বহু বৎসর যাবৎ সাহিত্য জগতের বহু উপকার করেছেন—সে বিষয়ে তো কারো মতদ্বৈধ নেই, কাজেই একটা উপলক্ষ পেয়ে তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় এমন কি ক্ষতি হয়েছে?

সম্বর্ধনার দু বছর পর রবীন্দ্রনাথ বিলেতে বিপুল সম্মান পেয়েছেন খবর পেয়ে আবার লিখছেন—"রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সম্বর্ধনা করা না হইত, এবং আজ বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এতো বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না। আর আজ সাহেবী সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাংলাদেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল তাহাতে দেশের মুখরক্ষা হইয়াছে।"

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ টাউন হলে মহা সমারোহে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ফুলের তোড়া দিয়ে টাউন হলের বাইরে এবং ভেতরে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। হলের মধ্যে ধূপের সুগন্ধ। প্রকাণ্ড হলঘর ও বারান্দা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো অসংখ্য সাহিত্য-রসিক সাধারণ ও বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষের ভিড়ে। এমন কি বেশ কিছু মহিলাকেও প্রথম দিকের সারিতে বসে থাকতে দেখা যায়। সে যুগের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি যে কদাচিৎ-ই ঘটতো সেকথা আজ সকলেই জানেন। একটু দেরি করে যে সব ব্যক্তিরা গিয়েছিলেন, তাঁরা আর হলের মধ্যে ঢুকতে পারেননি। সামনের রাস্তাতেও ভিড় উপচে এসেছিলো।

(কয়েক বছর আগে সাহিত্যরসিক এক অতি প্রবীণ ব্যক্তি কথা-প্রসঙ্গে আমাদের কাছে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সভায় তাঁর উপস্থিত থাকার চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁর বয়েস তখন ২০, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৭ বছর বয়সী ছোট ভাইকে। ইনি তখনো পর্যন্ত ততোটা রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন না—যদিও পরে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে যায়। আর তাঁর ভাই শুরু থেকেই ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যভক্ত। উক্ত অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও মেসের তরুণদের মধ্যে খুব জল্পনাকল্পনা চলে—প্রচুর উদ্দীপনা দেখা দেয়। ইনি বিশেষ জোর দিয়ে আমাদের বলেন যে, তরুণদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাস্টারমশাইরা রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে হাসাহাসি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। এবং এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান তাঁদের আদৌ মনঃপূত হয়নি। যাই হোক, সভা আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে দু ভাই তো পৌঁছোলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা তো হতবাক! প্রথমেই যে কথাটা তাঁদের মনে জাগে তা এই—এতো রবীন্দ্রভক্তও তাহলে আছেন!! স্কুলশিক্ষক—কলেজ শিক্ষক ও গুরুজনদের অধিকাংশেরই মুখে তিনি এযাবৎ শুনে এসেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি পড়লে চরিত্র নষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা এবং সামান্য কয়েকজন ব্রাহ্ম এবং মেয়েলী প্রকৃতির কিছু পুরুষরাই

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাচানাচি করেন।

টাউন হলের সামনের রাস্তায় বহু উৎসাহী তরুণ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদের সংখ্যা হলের মধ্যেও কম ছিলো না। সভা আরম্ভ হওয়ার কুড়ি মিনিট আগে চেয়ারগুলি সব ভর্তি হয়ে যায়। এবং সভা যখন ঠিক সময়ে আরম্ভ হলো, তখন হলঘরের চেয়ারের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানোর জায়গা এবং দু'পাশের করিডোর পর্যন্ত ঠেসাঠেসি। প্রবীণেরাও যোগ দিয়েছিলেন মোটামুটি রকম। বেশ কিছু অবাঙালী ভারতীয়ও এ-সভায় উপস্থিত। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই দক্ষিণভারতীয় ও মারাঠী। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁদের হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ায় উনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা রবিবাবুর কবিতা ভালোভাবে পড়ো তো?' ছোট ভাই সগর্বে তখন ওঁকে 'রাজা ও রাণী' কাব্যনাট্যের কয়েকটি চমৎকার সংলাপ ও 'বসুন্ধরা' কবিতার অংশ-বিশেষ চটপট শুনিয়ে দেন। সেকালে রবীন্দ্রভক্তরা অনেকেই ওঁর কবিতা তো বটেই পুরো নাটকও মুখস্থ রাখতেন। অত্যন্ত প্রীত জগদিন্দ্রনাথ ওঁদের দুই ভাইকে রবীন্দ্রনাথের একেবারে খুব কাছে নিয়ে গেলেন। জ্যোতির্ময় পুরুষ ওঁদের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসেছিলেন। কথা বলতে দারুণ ইচ্ছে হলেও ওঁরা সাহস পাননি। একদৃষ্টে সেই প্রতিভা-উজ্জ্বল রূপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। মানপত্র পড়ার পর শ্রোতারা 'সাধু সাধু' চিৎকারে আনন্দ জানান সেকথাও স্পষ্ট মনে পড়ে। সভা শেষ হবার পর উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন—ইতিপূর্বে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা ওঁরা দু ভাই দেখেননি। সভার অন্যতম কর্মকর্তা অপেক্ষাকৃত কমবয়সী, ফর্সা, পাতলা চেহারা তীক্ষ্ণ নাসা এক ব্যক্তিকে খুব নজরে পড়েছিলো। পরে নাম জানেন—প্রমথ চৌধুরী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌরবর্ণ প্রশান্ত চেহারাটিও মনে খুব ছাপ ফেলে। সহাস্য মুখ খুব বলিষ্ঠ গঠন রবীন্দ্রনাথের এক ভাইপোকেও প্রথম দেখেন সেদিন—শুনেছিলেন যে তিনি নাকি ভালো শিল্পী—তাঁর নাম অবনীন্দ্রনাথ। যে সব চাঁই চাঁই সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং সম্পাদক এই অনুষ্ঠান ভণ্ডুলের পক্ষপাতী

ছিলেন—তাঁদেরও কেউ কেউ এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন অবশেষে—সেটাও ইনি দেখেন।)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পড়ে শোনালেন একটি সুন্দর মানপত্র। এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন উপহার, হাতির দাঁতের ফলকে খোদাই করা অভিনন্দন, রূপোর অর্ঘপাত্র, সোনার তৈরি অতি চমৎকার পদ্মফুল এবং সোনার সুতোয় গাঁথা মালা।

"অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

করকমলেষু

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন বন-শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদগণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্ধ্বব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষীগণ স্বহস্ত-রচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিয়া বাঙলার মাটি ও বাঙলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগদেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ;

রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্তৃক গন্ধর্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাষিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনো-মোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ু কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।”

রবীন্দ্রনাথের পরনে সেদিন ছিলো সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি ও সাদা চাদর। এক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর রিপোর্টে লেখেন যে, ডায়াসে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই খুব শান্তভঙ্গীতে বসেছিলেন এবং তাঁর চেহারার “অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য” সব দর্শকদের হৃদয় হরণ করেছিলো।

বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ভাষণ দিয়েছিলেন। নবীন এবং প্রবীণ বক্তারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। এবং সেই পবিত্র পরিবেশে দর্শকেরা একেবারে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি দেশবাসী যে কতোখানি কৃতজ্ঞ, তার খোলাখুলি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো এদিন হৃদয়ভরা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বাঙালীর হৃদয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সেই প্রথম।

সভায় চাঞ্চল্য এনেছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ৩০ বছর আগের লেখা কবিতা পাঠ করে।

ব্যাপার হলো এই ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস, তখন তাঁদের বয়েস যথাক্রমে ৪৩ ও ৩৬। ঐ গীতিনাট্যের লেখক ও প্রধান অভিনেতা ১৯ বছরের রবীন্দ্রনাথ। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সামনে তিনি সেই প্রথম অভিনয় করেন।

অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে একটি অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন, আর গুরুদাস তো একটি কবিতাই লিখে ফেললেন। অবশ্য ছাপাননি। বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল, কবিতাটি সেদিন অনেকেই অনুমোদন করতে পারেননি। কারণ তাঁদের মনে হয়েছিলো, মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে যেন একটা—যেন কেন, নিশ্চয়ই—তুলনা দেয়া হয়েছে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এতোটা মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। কোথায় বাল্মীকি আর কোথায় রবীন্দ্রনাথ !!

গুরুদাস কিন্তু কবিতাটি ফেলে দেননি। একটি ভালো কাগজে সুন্দর করে লিখে কবিতাটি রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। সংবর্ধনা সভায় শ্রোতাদের অনুমতি নিয়ে তিনি সেই ৩০ বছর আগের লেখা কবিতাটি পড়ে শোনালেন।

"উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর/অজ্ঞান তিমিরে সুপ্রভাত হলো হেরো, উঠেছে নবীন রবি, নবজগতের ছবি,/নব বাল্মীকি প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার।/হেরো তাহে প্রাণভরে/সুখ তৃষ্ণা যাবে দূরে/ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি/পাবে শান্তি অনিবার।/'মণিময় ধূলিরাশি', খোঁজ যাহা দিবানিশি/ওভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।"

বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যটি এই—মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় উপস্থিত বিপুল জনমণ্ডলী আদৌ ক্ষুণ্ণ হননি সেদিন। সময় বদলে গেছে। শুধু ৩০ বছরই অতিক্রান্ত হয়নি, নতুন যুগ এসেছে বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রপ্রতিভা বদলে দিয়েছে সব কিছু।

কবিতাটি শুনে জনতা সেদিন প্রবল হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

সম্বর্ধনা সভার একটি চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন সীতা দেবী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিদুষী কন্যার নাম আমরা সকলেই জানি। তা সীতা দেবীর বয়েস তখন প্রায় ১৮। উনি টাউন হলে বেশ কিছুক্ষণ আগে পৌঁছোন। ভিড় দেখে তিনিও চমকে যান। তখনো রবীন্দ্রনাথ আসেননি। জনতা আসছে দলে দলে। টাউন হলের একদিকে রবীন্দ্রনাথের ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী খোলা হয়েছিলো। লোকে সেখানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছে। তিনিও দেখে এলেন। এদিকে জনতা তো চুপচাপ ভালো মানুষের মতো বসে থাকতে পারে না—এক-একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলঘরে ঢুকছেন, আর তাঁদের দেখে প্রচণ্ড হাততালিতে উল্লসিত দর্শকেরা যেন ফেটে পড়ছে। এরকম দারুণ হাততালির মধ্য দিয়েই প্রবেশ করলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ।

এরপর বিরাট টাউন হল যখন প্রচণ্ডতম হাততালির শব্দে প্রায় টলতে শুরু করলো তখন বুঝলেন রবীন্দ্রনাথ আসছেন। তাঁর চারদিকে বিষম ভিড়, মঞ্চের ওপর উঠে না বসা পর্যন্ত তাঁকে একরকম দেখতেই পাওয়া গেল না। তারপর ঐক্যতান বাজনা শুরু। কিন্তু দর্শক বা শ্রোতাদের প্রাণপণ চিৎকারে ঐক্যতান বাজনা মাথায় উঠেছে। কিছু শোনা অসম্ভব। সভাপতি সারদাচরণ মিত্র বক্তৃতা শুরু করলে হৈ-হল্লা অনেক কমে যায়। তারপর পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য সংস্কৃত ভাষায় স্বস্তিবাচন করেন। এবার অভিনন্দন পত্র পড়ে শোনান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ওঁর সেদিনের 'আনন্দ বিকশিত মুখ' এবং মানপত্রের শেষ লাইন 'কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন' জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ—সীতা দেবী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরেও ভুলতে পারেননি। মানপত্র পড়ার পর অনেকগুলি আইটেম ছিলো। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী রচিত 'বাণীবরতনয়, আজি স্বাগত সভামাঝে' গানটি গেয়ে শোনানো হয়, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে জরির স্তবকের মালা পরিয়ে ওঁর হাতে সোনার পদ্মফুলটি তুলে দেয়া হলো। হলভর্তি লোক আনন্দে চিৎকার করছে—'ওঁকে কি কি উপহার দেয়া হচ্ছে আমরা

দেখতে চাই।' রামেন্দ্রসুন্দর তখন হাত উঁচু করে দেখালেন, আবার হাততালি।

এরপর অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উপলক্ষ মাত্র বলে উল্লেখ করে এ সভায় পাওয়া সব সম্মান ও আদর জননী বঙ্গ-ভাষা এবং দেশের মানুষকে উৎসর্গ করলেন।

তারপর মেয়েদের ডাক পড়লো "পুষ্প-অর্ঘ্য" দেবার জন্য। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হতে অন্যান্য কিশোরী ও মহিলার সঙ্গে সীতা দেবী এগিয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সেই মানব-শ্রেষ্ঠ ফুল উপহার নেন। এবার 'পুষ্প অর্ঘ্য' দেয়ার পালা সাহিত্যিকদের। বিখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে সেই প্রথম দেখেন সীতা দেবী। সেই প্রথম এবং শেষ—কারণ পরবর্তী দীর্ঘকাল দুজনে বেঁচে থাকলেও দুজনের দেখা আর হয়নি। তা সে সভায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পড়েছিলেন মহা দুর্গতিতে। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার হলেও তিনি খুব লাজুক ভালোমানুষ প্রকৃতির। সভা সমিতিতে বলতে গেলে যেতেন-ই না। কিন্তু বরাবরের রবীন্দ্রভক্ত এই অত্যন্ত মার্জিত রুচির মানুষটি সেদিন না এসে পারেননি। সভায় দুর্দান্ত লোকের ভিড়ে এবং মহিলাদের উপস্থিতিতে তিনি একেবারে গলদঘর্ম হয়ে ফুলের তোড়া হাতে হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে। না পারেন এগোতে—না পারেন পেছোতে। অবশেষে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের সামনে আনলে মহাখুশী প্রভাতকুমার হাতের ফুলের তোড়া উপহার দেন। আরো কটি গান ও ঐক্যতান বাজনার শেষে সভা ভঙ্গ হলো। প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হলের বাইরে চলে গেলেন। আগাগোড়া ফুলের মালায় সজ্জিত তাঁর গাড়ি পথের বাঁকে মিলিয়ে যাওয়ার পর তবে প্রবল ভিড়ের চাপ কমে।

'ভারতী'-র একশো বছর

১০৩ বছর আগেকার কথা, ঘটনাস্থল উত্তর কলকাতার এক বনেদী বাড়ির দোতলার ঘর, এক তরুণ, ওঁর সদ্য লেখা নাটক 'সরোজিনী'র প্রুফ দেখায় ব্যস্ত। প্রুফ সংশোধনের সহায়ক এ বাড়ির-ই প্রবীণ গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য। তরুণ নাট্যকারের বয়েস ২৫, ইতিপূর্বে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক পূর্ণাঙ্গ প্রহসন লিখে বেশ খ্যাতি পেয়েছেন। স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' প্রহসনটির সমালোচনা করেছেন এইরকম—"একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে, সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে, হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জিত—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী'। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নয় বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এই প্রহসনের একটি গুণ এই যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক, এ প্রহসন, প্রহসন মাত্র কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক নিতান্ত অভাবও নাই এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে, তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য, তাহাতে অনিষ্ট নাই ইষ্ট আছে···। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাংলা প্রহসনে প্রায়ই তাহা অসহ্য কষ্টকর।···মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে পারা যায় 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে কদর্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই, এমন কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।"

যাই হোক, তা রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভ্যেস প্রুফ জোরে জোরে পড়া। পাশের ঘর থেকেও শুনতে পাওয়া যায়। পাশের ঘরে পড়াশোনা করেন নাট্যকারের ছোট ভাই। বয়েস প্রায় চোদ্দ।

প্রুফ পড়া চলছে গত কয়েক দিন ধরে। রোজই ছোট ভাই দাদার নাটকের প্রুফ পড়া উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। মাঝে মাঝে উঠে এসে কোন জায়গায় কোন কথা পালটে কোন কথা বসালে আরো ভালো হয়, সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতেও কুণ্ঠা নেই।

তরুণ নাট্যকার অতি উদার মনোভাবের লোক, তাছাড়া ছোট ভাইকে ভালোওবাসেন খুব, তাই তার মতামতে কখনো রাগ করেন না, সম্ভব হলে মেনেও নেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

সেদিনের প্রুফ পড়া পৌছোলো নাটকের এক নিদারুণ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে।

'সরোজিনী' নাটক রচিত হয়েছে মুসলমান আক্রমণকারী বনাম রাজপুতদের প্রতিরোধের পটভূমিকায়। অবশেষে রাজপুত বাহিনী পরাজিত, বিধ্বস্ত। মুসলমান সেনা দুর্গ লুঠ করতে এগিয়ে আসছে। অন্তঃপুরের মহিলারা দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পেরে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জহর ব্রতের আয়োজন করলেন।

জ্বলন্ত চিতায় রাজপুত মহিলাদের প্রবেশের দৃশ্যে একটি গদ্য বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছেন নাট্যকার। সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে মহারানী ঐ বক্তৃতা দেওয়ার পর একের পর এক আত্মাহুতির পালা।

রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য মহাশয় যথারীতি চেঁচিয়ে ভাষণটি পুরো পড়লেন এবং তারপরই তরুণ নাট্যকারের ছোট ভাইয়ের প্রবেশ। সোজা বললেন, নতুনদা এ জায়গায় এ বক্তৃতা একেবারেই চলবে না—আপনি বদলে দিন। ওখানে পদ্য না বসালে বেখাপ্পা হয়ে যাবে।

নাট্যকার একজন খাঁটি রসজ্ঞ ব্যক্তি, বক্তৃতাটি লেখবার সময়ে তাঁরও মন খুঁতখুঁত করেছিল। ঠিক মানাচ্ছে না। কেমন যেন কষ্টকল্পিত কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু এখন করাই বা যায় কি ? বদলাবার তো সময় নেই। আজই প্রেসে 'ম্যাটার' দিতে হবে।

সে কথাই ছোট ভাইকে বললেন, ছোট ভাই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে জবাব দেন, ঠিক আছে নতুনদা, গদ্য বক্তৃতার বদলে আমিই একটা গান লিখে দিই ?

এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি দুর্দান্ত গান প্রস্তুত হয়ে এলো। তার কয়েকটি লাইন,

জ্বল জ্বল চিতা। দ্বিগুণ, দ্বিগুণ/পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।/ জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন/জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।/শোনরে যবন শোনরে তোরা/যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,/সাক্ষী রলেন দেবতা তার/এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।···আয় আয় বোন।/আয় সখি আয়।/ জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়/সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়/জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।" প্রসঙ্গত বলে রাখি 'সরোজিনী' নাটক পরে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। যাকে বলে, জমজমাট নাটক! আর দারুণ হিট গান হয়েছিলো। ঐ 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।' দর্শকরা হন্যে হয়ে ঐ দৃশ্য দেখতেন। গানটি ফিরতো মুখে মুখে। অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী বিনোদিনী এ নাটকে অন্যতম প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে 'রূপ ও রঙ্গ' সাময়িক পত্রে লিখেছেন— "'সরোজিনী' নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন, সেই দর্শকবৃন্দ-ও আত্মহারা হয়ে যেতেন, যে কোন একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে···। 'সরোজিনী' নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন, সেই দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তখন তো বিদ্যুতের আলো ছিল না, স্টেজের উপর ৪।৫ হাত লম্বা টিন পেতে তার ওপর কাঠ জ্বেলে দেওয়া হত। সকলে 'জ্বল জ্বল চিতা' গান গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরাসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবু

কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

ছোট ভাইয়ের লেখা গানটি তখুনি অনুমোদন করেন তরুণ নাট্যকার। খুব চমকেও গিয়েছিলেন, এবং সেই চমকের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়নি, ফল হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। ১৪ বছর বয়সী ছোট ভাইকে দাদা সেই দিন থেকেই "প্রমোশন" দিয়ে পুরোপুরি নিজের সাহিত্য-সঙ্গী করে নিলেন। ইতিপূর্বে ওঁর একটিমাত্র সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন—তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, তৎকালীন এক রোমান্টিক কবি ও ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ.। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানে মাদুর পেতে একটি পাঠশালা বসতো। বাড়ির ছেলেরা ছাড়াও সেখানে কিছু বাইরের ছেলেও আসতো পড়তে। অক্ষয়চন্দ্র এদেরই একজন। সেই তখন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে গাঢ় সখ্যতার সূচনা হয় তা চিরকালই অটুট ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের অকাল মৃত্যু (১৮৯৮ খৃঃ) সে বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। মানুষটি ছিলেন অতিশয় সাহিত্যপ্রেমিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ওঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "অক্ষয় এম. এ. বি. এল পাশ করিয়া এটর্নি হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর ন্যায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি মানুষ কি কখনও সংসার কার্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে?"

ছোট ভাইকে নিয়ে সাহিত্য আলোচনার সদস্য এবার দাঁড়ালো তিনজন।

এই তিনজনের আন্তরিক ইচ্ছে ও চেষ্টায় দেড় বছর পর অভ্যুদয় হলো 'ভারতী' মাসিক পত্রের।

কাজেই 'জ্বল জ্বল চিতা' গানটি রচনাকে পরোক্ষ ভাবে 'ভারতী' মাসিক পত্রের অঙ্কুর আখ্যা দেয়া যায়।

না বলে দিলেও চলে যে তরুণ নাট্যকার ও তাঁর ছোট ভাই, যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

১৮৭৭ খৃঃ নাগাদ বাংলা ভাষায় অন্যান্য মাসিক পত্রের কি খবর?

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে অপূর্ব এক নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এলো। দুঃখের বিষয়, মাসিক পত্রটির আয়ু ছিলো বড়ো স্বল্প। চার বছর চলে—এর মধ্যে আবার চতুর্থ বছরের মান আগের তিন বছরের চেয়ে নীচু। অতঃপর সঞ্জীবচন্দ্র ধরলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর হাল, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনার সঙ্গে তাঁর সম্পাদনার অবশ্য কোনো তুলনা হয় না। তবে একথাও ঠিক, সঞ্জীব সম্পাদিত বঙ্গদর্শনও বেশ ভালো কাগজ ছিলো, কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল তাঁর বঙ্গদর্শনের নিয়মিত প্রকাশের কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। শ্রাবণ সংখ্যা অগ্রাণে, আর পৌষ সংখ্যা চৈত্রে—এতো অনিয়মিত প্রকাশে কি কোনো সাময়িকপত্র টেকানো যায়, নাকি তার ইজ্জত থাকে?

'আর্যদর্শন' (১৮৭৪-১৮৮৫) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত একটি মোটামুটি চালু মাসিক পত্র। ১১ বছর স্থায়ী এই মাসিকটিরও প্রকাশনা কিন্তু মোটেই নিয়মিত ছিল না।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' সে যুগের আরেকটি মাসিকপত্র। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এটি রাজশাহীতে তিন বছর চলবার পর রাজশাহীর পাট চুকিয়ে নবকলেবরে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামে প্রকাশিত হয় কলকাতায়। বালক রবীন্দ্রনাথের (তাঁর বয়েস তখন প্রায় ১৪) আখ্যায়িকা কাব্য 'বনফুল' ধারাবাহিক ভাবে বার হলো মাসিক পত্রটিতে। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য তথ্য এই, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'-ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করে। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ও হরিশচন্দ্র নিয়োগী সে যুগের তিন কবি। এঁদের তিনখানি কাব্যগ্রন্থ—যথাক্রমে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখ সঙ্গিনী'র বিস্তৃত সমালোচনা ছিলো ঐ প্রবন্ধে।

দেখাশোনা করার উপযুক্ত লোকের অভাবে মাসিক পত্রটির অকাল মৃত্যু হয় ১৮৭৭-এর শুরুতেই।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' (প্রথম পর্যায়ে ১৮৭৪-১৮৮৭) নিঃসন্দেহে ছিলো একটি ভালো মাসিকপত্র—

অবশ্য এটিও নিয়মিত প্রকাশের খুব বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকেনি।

এই পটভূমিকাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিলেন, একটি 'ভালো' মাসিকপত্র বার করবেন। 'ভালো' অর্থে 'বঙ্গদর্শনের মতো'।

অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আরো তিন মহিলার সাগ্রহ সমর্থন যুক্ত হলো, নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অক্ষয়চন্দ্রের স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরানী (লাহোরিণী)।

রবীন্দ্রনাথের এক দিদির নামও শরৎকুমারী। তিনি স্বর্ণকুমারীর ওপরের বোন। এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ৭ বছরের বড়। তিনি কিন্তু এই লেখিকা শরৎকুমারী নন। দুই শরৎকুমারীর নাম যাতে গুলিয়ে না যায় সেই জন্য দুজনকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে 'লাহোরিণী' নামে ডাকা হতো। কারণ ওঁর বাল্যকাল কাটে লাহোরে। বলা বাহুল্য, লেখিকা শরৎকুমারী ঠাকুর পরিবারের কেউ নন। যদিও স্বামী অক্ষয়চন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক নিছক আত্মীয়তা বন্ধনের চেয়েও ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ ও মধুর ছিল।

কাদম্বরী দেবীর বয়েস তখন ১৮, স্বর্ণকুমারীর ২২, শরৎকুমারীর ১৬। স্বর্ণকুমারীও তখন বিবাহিতা ও দুটি সন্তানের মা, স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যাওয়ায় তিনি সে সময়ে বাপের বাড়িতেই রয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক খ্যাতি 'ভারতী' প্রকাশের আগে থেকেই, আগের বছর (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়েছে ওঁর উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'—বাংলা ভাষায় মহিলা রচিত প্রথম উপন্যাস।

তা নতুন মাসিকপত্র বার করার ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রথমে গেলেন বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে। একেবারে নতুন মাসিকপত্রের ঝক্কি কাঁধে নিতে উনি তো প্রথমটায় রাজি নন—উনি বললেন, তার চেয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিকপত্রটিকেই ভালো করে জাঁকিয়ে বার করা হোক।

'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। কাজেই এ কাগজে সব রকমের রচনা প্রকাশ সম্ভব নয়। আর সব ধরনের লেখা না ছাপলে, তা শিক্ষিত

বাঙালীর সর্বস্তরের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না—এই সত্যটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের মত বদলালো। নতুন মাসিকপত্রের সম্পাদক হতেও তিনি রাজি হলেন। অবশ্য সম্পাদনার পুরো ঝক্কি তাঁর কাঁধে পড়েনি। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"আমি ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম।"

শরৎকুমারী চৌধুরানীও বলেছেন—"যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটি কখনই 'ভারতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানস কন্যা!"

এবার ভালো দেখে একটা নাম ঠিক করতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ নামকরণ করলেন—"সুপ্রভাত"। নামটি ভালো, কিন্তু ঐ নাম দেয়া কি উচিত হবে?

সে যুগটাই অতিশয় ভদ্রলোকের যুগ। তার ওপর এঁদের অসামান্য মার্জিত রুচি ও মহৎ প্রকৃতির তুলনা-ই নেই। এঁরা ভেবে দেখলেন—'সুপ্রভাত' নামটির মধ্যে একটা যেন হামবড়াই স্পর্ধার ভাব আসে। মানেটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, এ যাবৎ বাঙলা সাহিত্য অন্ধকারে ডুবেছিলো—এতকাল পরে এঁদের দিয়েই বাংলাসাহিত্যে অন্ধকার দূর হয়ে সুপ্রভাত হলো।

না, এ নাম চলবে না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-ই দ্বিতীয় নামটি দিলেন—'ভারতী'। এই নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো এবং এই নামই বয়ে চললো পরবর্তী দীর্ঘ ৫০ বছর। কতো শোক দুঃখ মৃত্যু উত্থান পতন—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে 'ভারতী'। সম্পাদক বদল হয়েছে কতোবার, আনন্দ ও আশা এবং আশাভঙ্গের বেদনাকে সাথী করে 'ভারতী'র দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। বাংলা ভাষায় এটিই সর্বপ্রথম মাসিকপত্র যা একটানা ৫০ বছর স্থায়িত্বের গৌরব অর্জন করেছে।

১৮৭৭-এর জুলাই (শ্রাবণ) মাসে 'ভারতী'র আত্মপ্রকাশ। মলাট

এবং টাইটেল পেজের ব্লক তৈরি হলো আর্ট স্টুডিওর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে। দেশী সাময়িকপত্রে এ ধরনের 'পরিষ্কার ও সুন্দর' ছবি ছাপার রেওয়াজ সে যুগে তেমন আর কৈ? তাই ছবিটি তখন অনেকের-ই মনোহরণ করে।

প্রথম সংখ্যায় ভূমিকা বা সম্পাদকীয় লিখলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অত্যন্ত আন্তরিক ও চমৎকার লেখা। একটুখানি বেশি ছড়িয়ে কথা বলার অভ্যেস, শব্দ ও বাকভঙ্গী নির্বাচনে একটু বেপরোয়া, সেই সঙ্গে ঈষৎ গুরুচণ্ডালী দোষ,—চোখ বুজে ধরে ফেলা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার বিশেষ স্টাইলটি, এ অননুকরণীয় বাংলা লেখার ফ্লেভার-ই আলাদা!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা একদম পছন্দ করতেন না বঙ্কিমচন্দ্র। বলতেন, শব্দ ও বাকভঙ্গী নির্বাচনে ওঁর শিথিলতা অতিশয় আপত্তিজনক ও গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে তাঁর খোলাখুলি অভিমত তরুণ রবীন্দ্রনাথকেও জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার সবচেয়ে বড়ো দোষ এই যে, উনি কোনো লেখা সুন্দর আরম্ভ করেছেন, পড়তেও ভালো লাগছে—হঠাৎ এমন একটি অমার্জিত বা লঘু বা অকুলীন শব্দ লেখার ফাঁকে বসিয়ে দেন, যা পুরো লেখাটার গৌরব নষ্ট করে "ইতর বা গ্রাম্য" করে দেয়, এবং ভদ্র পাঠকচিত্তও তখুনি ওঁর লেখার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এ মত রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথের ধরনে অবশ্য নিজে কখনো না লিখলেও, বড়দার লেখার অনুরাগী ছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাই এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন। তর্ক করে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত বদলাতে পারেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বরাবরই দৃঢ় ছিলো যে, দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ভাষায় লেখারও কোনো সার্থকতা নেই।

[এই প্রসঙ্গে একটু অবান্তর হলেও বলে রাখি, পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার ধরনকে আদর্শ করে সাহিত্য ক্ষেত্রে আসেন আরেক বাঙালী সাহিত্যিক। ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের

দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ্যভাবে সমর্থন জানিয়ে এবং আরো অনেক বেশি গুরুচণ্ডালী করে ও পাঁচরকম শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গী প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি নিজের ভাষাকে আশ্চর্য গতিশীল রূপ দেন। প্রয়োজন বুঝলে একই সেণ্টেন্সে তিনি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও নির্ভেজাল স্ল্যাং বেমালুম মিলিয়ে দিতেন। শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের হৃদয় জিতে নিয়ে যে জয়পতাকা ওড়ান, তা এখনো অম্লান—তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী।]

ভারতী ১৭৯৯ শক

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আরেক অর্থ বিদ্যা, আরেক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব, কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত মানসে যে আমরা এইরূপ করিব তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি, কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্তি সম্ভবে কিন্তু উপার্জন সম্ভবে না, যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আরেক জাতি হইতে তাঁদের ভাব উপার্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহাদের মনে করা মাত্রই সার! পাদরী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙালীর মত বাঙলা লিখি এবং ঈঙ্গ-বঙ্গরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহাদের সে সুখস্বপ্নে

আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস 'শকুন্তলা'র এক স্থানে বলিয়াছেন 'স্ত্রীনামশিক্ষিতপটুত্বং'—স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিত পটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে স্ফূর্তি পাইয়া থাকে।

কবিত্ব রূপ নির্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন "প্রেম কি যাচলে মেলে? খুঁজলে মেলে। সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।" স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয়, তাহা কৃত্রিম তাহা কোন কার্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়, 'হার্প' কি শোভা পায়? সেই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটেনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার বহুপূর্বে এথেন্স-নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনার্ভা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে-কারণ কি? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আর্যভাষা মূলসমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে, আর্যভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যাসম্পদের বীজ প্রথমে ভারত ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়। পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারত-ভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যেদিকে দেখা যায়, সেদিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে প্রগাঢ় মিল। অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাসশিখর, ভারতীর তেমনি ভারত-

ভূমি। কিংবা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রতা দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে, তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী দেবীকে বলি যে, "হে মাতঃ ভারতি! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র-বদনজ্যোতি কাল যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়কালেও তাহা অন্তর্হিত হইবে না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার সনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজ দোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আহ্বান-পূর্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম, এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন। ভারতীর আশীর্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র শুনে নিন—(১) ভূমিকা (২) ভারতী (কবিতা)। (৩) তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক (প্রবন্ধ)। (৪) মেঘনাদবধ কাব্য (সমালোচনা)। (৫) জ্ঞাননীতি ও ইংরাজী সভ্যতা (প্রবন্ধ)। (৬) বঙ্গসাহিত্য (রমেশচন্দ্র দত্ত-র 'বঙ্গসাহিত্য'র ওপর আলোচনা)। (৭) গঞ্জিকা (রম্যরচনা)। (৮) ভিখারিণী (গল্প)। (৯) সম্পাদকের বৈঠকে। (১০) স্বাস্থ্য।

প্রথম তিন বছর 'ভারতী'তে লেখকের নাম উল্লেখিত হয়নি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, প্রথম সংখ্যায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের দুটি লেখা ছিলো—

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা ও ভিখারিণী। সমালোচনাটি ৪টি সংখ্যায় ও গল্পটি ২টি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

'ভারতী'র সূচনা খুব ঘরোয়া ভাবেই হয়েছিলো। বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাদ দিলে বাইরের লোকের লেখা বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। প্রধান লেখক অবশ্যই কিশোর রবীন্দ্রনাথ, নানান ধরনের লেখা লিখেছেন। কবিতা, সমালোচনা, প্রবন্ধ থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস 'করুণা' পর্যন্ত! কোনো কোনো সংখ্যায়, তাঁর একারই ৪টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে—অবশ্য নাম ছাপা হয়নি। উনি ছাড়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই থেকে লেখা পাঠাতেন প্রায়ই।

শুরুতে ভারতীর বিক্রি মোটেই ভালো হয়নি। অন্যত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি বাড়াবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু প্রথম তিন বছর তেমন সুফল দেখা যায়নি।

অবশ্য তাই বলে 'ভারতী'র প্রকাশ অনিয়মিত ছিলো না। নির্দিষ্ট তারিখে না হোক, মাসেরটা সে মাসেই বার হয়েছে।

বিক্রি না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আগেই বলেছি যে, 'ভারতী' সূচনায় ঘরোয়া পারিবারিক ধরনের পত্রিকা ছিলো, তাই বাইরের পাঠকের উৎসাহ তেমন দেখা যায়নি, এছাড়া 'ভারতী' কর্তৃপক্ষগণ খুব কৃতবিদ্য ও বড়ো লেখক হলেও মাসিক পত্র নিয়মিত চালিয়ে লাভজনক ব্যাপারে দাঁড় করানোর প্র্যাকটিকাল বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না মোটেই। আর তিন নম্বর কারণ, সে সময়ে মাসিক পত্র কিনে পড়ার রেওয়াজ হয়নি, উৎসাহী পাঠক সংখ্যাও খুব বেশী ছিলো না। এবং বহু শিক্ষিত বাঙালী বাঙলা মাসিক পাঠে নিরুৎসুক ছিলেন। অতো নাম করা যে বঙ্গদর্শন, তুঙ্গ অবস্থাতেও প্রতি মাসে ছাপা হয়েছে আর কতো? মাত্র ১০০০। ঘরোয়া ভাবে শুরু হলেও 'ভারতী'র মান বেশ উঁচু ছিলো। লেখকেরা সবাই শিক্ষিত, ভাবুক এবং লিখতেও জানেন। চতুর্থ বছরের গোড়া থেকেই ভারতীর বিক্রি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আরো দু'চারজন বাইরের লেখকও এই মাসিক পত্রে লিখলেন।

'ভারতী'র নিয়মিত বিভাগগুলি ছিলো রীতিমতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নতুন নতুন বিষয়ে পাঠকের মনের খোরাক যুগিয়েছে। 'সম্পাদকের বৈঠক' নামক নিয়মিত বিভাগটিতে পরিবেশিত হতো নানা চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক ব্যাপার। আজগুবী ঘটনা, খোশগল্প, দেশি ও বিলিতি জোকস, সাম্প্রতিক ঘটনা, ম্যাকবেথের অংশ (বালক রবীন্দ্রনাথ অনূদিত) বা ফরাসী নাটক ও প্রহসন (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনূদিত)।

বাংলা মাসিকপত্রে সম্পাদক এবং পাঠকের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র ছিলো "সম্পাদকের বৈঠক" বিভাগটি। এর আগে বাংলা মাসিকপত্রে এমন খোলামেলা রসালো বিভাগীয় রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। 'সম্পাদকের বৈঠক' থেকে প্রায় ১০০ বছর আগের একটি চুটকি খোশগল্পের নমুনা দিচ্ছি। যদিও এটি বিলিতি জোক, বাংলা ভাষায় এর উপস্থাপনা প্রায় নিখুঁত।

মঙ্গল ও অমঙ্গল সমাচার (ভাদ্র ১২৮৪)

দুই বন্ধু পরস্পর সাক্ষাৎকারে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কেমন আছেন?

তিনি বলিলেন,—ভাল নাই, অল্পদিন হইল আমি বিবাহ করিয়াছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—ইহা সুসমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি—বড় সুসমাচার নয়, যে স্ত্রীকে আমি বিবাহ করিয়াছি সে অত্যন্ত কুঁদুলে।

দ্বিতীয়—ইহা অমঙ্গল সমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম—বড় অমঙ্গল সমাচার নয়, কারণ বিবাহের সময় আমার শ্বশুর বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—ইহা সুসমাচার বটে।

প্রথম—বড় সুসমাচার নয়, কারণ আমি ঐ টাকা দিয়া মেষ ক্রয় করিয়াছিলাম, সে সকল মেষ মড়কে মরিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়—বড় দুঃখের বিষয়।

প্রথম—বড় দুঃখের বিষয় নয়, কারণ ঐ মেষের মূল্য যত ছিলো,

তাহা অপেক্ষা তাহাদের চর্ম বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাইয়াছি।

দ্বিতীয়—তবে ত আপনার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

প্রথম—বড় ক্ষতিপূরণ নয়. কারণ ঐ টাকায় আমি এক বাড়ি নির্মাণ করি, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়—বিলক্ষণ ক্ষতি বলিতে হইবে।

প্রথম—বড় ক্ষতি বলা যায় না—যেহেতু, বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমার কুঁদুলে স্ত্রী-ও পুড়িয়া মরিয়াছে।

পুস্তক সমালোচনা বিভাগটি একটু দেরি করে খোলা হয়, এ বিভাগটিও পরিচালিত হতো বড়ো চমৎকার। নিরপেক্ষ ন্যায্য সমালোচনা তো বটেই, সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টিও পাঠক অনুভব করতেন। বইয়ের শুধু গুণাগুণ বিচার-ই নয়, সামাজিক অসাম্য অবিচার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে 'ভারতী' লড়াই করেছে। তবে এ লড়াই অভব্য স্থূল, গালাগালি কিংবা হঠাৎ-চালাক শ্লোগানের লড়াই নয়—অন্যায়ের, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মার্জিত, হৃদয়বান ব্যক্তির লড়াই। আর কে না জানে, এই মরাল সাপোর্ট জাতির জীবনে চিরকালই অসামান্য।

'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের সমালোচনা এ প্রসঙ্গে আমরা উদ্ধৃত করছি।

'যুগল চিত্র। এই পুস্তকখানি নববধূদিগকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বঙ্গবধূর স্বভাব চিত্রিত, একজনের নাম শান্তি, অপরজনের নাম লীলা। শান্তি 'পরশমণি', লীলা 'কালকূট'। শান্তির স্বামী মাতাল, দুশ্চরিত্র, বিনা কারণে সে যখন তখন শান্তিকে পদাঘাত করে। শান্তি সমস্ত সহ্য করিয়া দেবতা জ্ঞানে তাহাকে পূজা করে। প্রতিদিন তাহার চরণামৃত পান করিয়া সে পবিত্রতা লাভ করে। আর লীলা? স্নেহময়, গুণময় স্বামীর সোহাগিনী হইয়াও সর্বদা স্বামীর নিন্দা করে। স্বামী ও শ্বাশুড়ী কিছুতেই তাহার মন যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে সে দুশ্চরিত্রা হইল। স্বামী মনোকষ্টে গৃহত্যাগ করিলেন। লীলা কুল-ত্যাগ করিয়া নানারূপ দুর্গতি ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যু-কালে অনুতপ্ত স্বামীদর্শনলোলুপ পাপীয়সী লীলা তাহার স্বামীর দর্শন

পাইল। সন্ন্যাসীবেশী স্বামী শিশিরকুমার লীলার সেই রুক্ষ, কর্দমময় মস্তকে আপন দক্ষিণ চরণ তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "অভাগিনী। আজ তোমার সকল পাপের ক্ষয় হলো। আজ আমার আশীর্বাদে অবশ্যই তোমার মোক্ষলাভ হবে।"

আমাদের বিবেচনায় স্বামী যদি সেই অনুতপ্ত মুমূর্ষু, হতভাগিনীর মস্তকে চরণ না তুলিয়া দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অশ্রুপাত করিতেন, তবে তাঁহার মানবোচিত ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। তবে হয়ত ব্রহ্মণ্যতেজ-মহিমান্বিত পুরাতন স্বামীর বর্তমান "আর্যাভিমানী" বংশধরগণের পক্ষে ইহাই মহত্ত্ব, ইহাই উপযুক্ত আদর্শ। আর পশুবৎ স্বামীর চরণামৃত পান ব্যবস্থা-ই তাঁহাদের অভিমতে আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা। নহিলে এদেশেরই বা এমন ঘোর দুর্দশা হইবে কেন!

এই বইখানি উপহার পাইয়া নববধূগণ যে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন এমন বোধ হয় না। লীলার চরিত্র নিতান্ত হীন কলুষিত, এইরূপ পৈশাচিক চরিত্র লাখের মধ্যে দু'একটি মেলে কিনা সন্দেহ। এই চরিত্র দৃষ্টান্তে সাবধান করিবার জন্য যদি নববধূদিগকে ইহা উপহার দেওয়া হইয়া থাকে ত, এইরূপ উপহার তাঁহাদের সম্মানের বিষয় নহে, বরঞ্চ তাহার বিপরীত।

আর বঙ্গসমাজে শান্তির ন্যায় আদর্শনীয়া রমণীর অভাব নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের এইরূপ কুক্কুরবৃত্তিপরায়ণতাতেই, যে সমাজের পুরুষেরা স্ত্রীলোকোচিত মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পান, সে সমাজের আদর্শ যে বিশেষ উচ্চ নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

আমাদের রমণীগণের চরিত্রে নৈতিক বলের অভাব-বশতই আমাদের সন্তানবর্গও হীনবীর্য তোষামোদকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে নারীর মাহাত্ম্য যে কি, তাহা যদি আমরা কিছুমাত্র বুঝিতাম, তাহা হইলে আমাদের সমাজের, আমাদের জাতীয় চরিত্রের এ দশা ঘটিত না। রমণী যদি নৈতিক মহত্ত্বে আস্থাবতী ও হীন পশুবৎ আচরণে ঘোর ঘৃণাবতী হন, তবে এই গুণ মাতৃদুগ্ধের সহিত সন্তানে প্রেমালাপনে স্বামীতে, শ্রদ্ধা কার্যে পিতৃস্থানীয়গণে, প্রীতি কর্মে বন্ধুবান্ধবে সঞ্চারিত হয়।

স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা ভাল। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীকৃত জঘন্য অন্যায়াচরণের প্রতিও কি শ্রদ্ধাবতী হওয়া ভাল? তাহাতে কার মঙ্গল? স্বামীর, স্ত্রীর, না সমাজের? প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের এরূপ হীনাবস্থা হইত না, যদি রমণীগণ তাঁহাদের সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতি, অমানুষোচিত আচরণের প্রতি ওজস্বিনী হইয়া পুরুষ-দিগের হীন কর্মের বাধা দিতে সক্ষম হইতেন, সেই রমণীই আদর্শ রমণী, যিনি পুরুষকে মনুষ্যত্বে হাত ধরিয়া উঠাইতে সর্বদা সচেষ্ট, সক্ষম।'

রঙ্গমঞ্চে পেশাদার এবং অপেশাদার নাট্যকে দলের অভিনয় সমালোচনা "ভারতী"তে করা হতো মাঝে মাঝে, অভিনয়ের গুণাগুণ বিচারের সময়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম উল্লেখের বদলে চরিত্র-গুলির নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়। সে যুগের সম্রান্ত সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রে নট-নটীদের নামের উল্লেখ খুব প্রার্থনীয় ছিলো না বলেই সম্ভবত এই ব্যবস্থা।

ঐ সমালোচনার মান কেমন ছিলো?

সে যুগের বিচারে তো বেশ ভালো-ই বলতে হয়, যাকে বলে, রীতি-মতো খুঁটিনাটি সমালোচনা এবং তা যথেষ্ট আন্তরিক ভঙ্গীতে লেখা। ভালো অভিনয়ের প্রাথমিক ও ন্যূনতম শর্তগুলি সম্বন্ধে "ভারতী"র সমালোচক ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। বর্তমান যুগেও যাত্রা এবং থিয়েটারে অতি অভিনয়ের প্রাবল্য আমরা প্রায়শই দেখে থাকি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগের উচ্চগ্রামে বাঁধা কাহিনীর শস্তা মেলোড্রামা। "ভারতী"তে প্রকাশিত একটি নাটক সমালোচনার খানিক অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। বিগত শতাব্দীতে লেখা সমালোচকের মন্তব্যগুলি আজকালকার বহু যাত্রা-থিয়েটারের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে নেহাৎ অন্যায় হবে মনে করি না।

'আমাদের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য দেখিতেছি, কতকাল হইল তাহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোড়ায় যাহা দেখিয়াছিলাম আজো তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতি হইল না, অবনতিও হইল না। বীর রস অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চিৎকার করিতে থাকেন,

করুণ রস হইলেই তাঁহারা নিঃশ্বাস টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্যরসের অবতারণা করিতে হইলে বিবিধ অপূর্ব অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বিকৃত কণ্ঠে যে কতপ্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার আর সীমা নাই। ধীর প্রশান্ত গম্ভীর অভিনয় যে কিরূপ তাহা তাঁহারা জানেন না। চটুল চপল আস্ফালনই তাঁহাদের আদর্শ। প্রশান্ত চিন্তাময় যে একপ্রকার বিষাদ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। তাহারা যখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন করুণ রসের আবির্ভাব দূরে থাকুক উলটা এমন বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে, আর ভাঁড়ামি না করিয়াও যে হাসাইবার সহস্র উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এ পর্যন্ত বুঝিবেন না? কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি দুই-চারিটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্চ্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই, করতালির পর করতালি, রঙ্গভূমির কদর্য বাদ্য অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তোলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনয়ের এবং অভিনেতাদের অভিনয়ের উপর দর্শক-মণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে দর্শকদের যাহাতে ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাঁহাদের কার্য করিতে হইবে—কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব, যদি দর্শকদের রুচি এতই বিকৃত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে, এবং তাঁহাদেরই হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতাও আছে…ন্যাশনাল থিয়েটারে আমরা 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি, মেঘনাদের চরিত্র অতি সুন্দর সংযতভাবে অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলা চরিত্র তেমনি জঘন্য। প্রথমত সে যাহাই বলুক না কেন, তাহার মুখের ভাবের কিছু-মাত্র পরিবর্তন হয় না, কি এক প্রকার হাস্য তাহার মুখে সমানভাবে লাগিয়াছিল। দ্বিতীয়ত সে অত দৌড়াদৌড়ি করে কেন বুঝিতে পারি-লাম না। সে ছুটিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে এবং ছুটিয়া রঙ্গস্থল হইতে

প্রস্থান করে …। রাবণের অভিনয় ভালো হয় নাই। যেখানে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ' ইত্যাদি, যাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে তীব্র উপহাসের ভাব গ্রথিত রহিয়াছে, কহিতেছেন, সে-স্থলে রাবণ এমন হাহাকার শব্দে বিলাপ করিয়াছিলেন যে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। রোদনের স্বরে কথা কহা প্রত্যেক অভিনেতার এমনি অভ্যস্ত যে তাহাই আশ্চর্য…!'

মুখ্যত 'ভারতী'কে অবলম্বন করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন। অনিবার্য কারণে সে প্রত্যাশা আর পূর্ণ হতে পারলো না। গভীর দুঃখ অনুভব করি যখন ভাবি যে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে, শুধু অনুবাদক রূপেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর কিছু প্রবন্ধ ও চুটকি রচনা পড়ে এখনো চমক লাগে। 'উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ' বা 'রামিয়াড' নামক চমৎকার নির্মল কৌতুকে টইটম্বুর প্রবন্ধটির মতো লেখা তো বড়ো সোজা কথা নয়।

অবশ্য, সরাসরি ফরাসী ভাষা থেকে অফুরন্ত অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কল্পনা-শক্তি ও সামর্থ্য দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। অনুবাদগুলি যেন প্রাণ পেয়ে নিজের ভাষায় কথা বলে উঠেছে—এর ওপর আছে ওঁর উজ্জ্বল ও অতি সাবলীল লেখার স্টাইল। ওঁর অনুবাদ তাই শুধু অনুবাদ-ই নয়, বাড়তি আরো কিছু। 'অলীক বাবু' 'হঠাৎ নবাব' ইত্যাদির পাঠক মাত্রেই আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে সমর্থন জানাবেন আশা করি।

মলিয়রের 'বুর্জোয়া জঁতিয়ম' নামক ফরাসী প্রহসন অবলম্বন করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন 'হঠাৎ নবাব'। এটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে 'ভারতী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গেঁয়ো অশিক্ষিত ও সরলচিত্ত দোকানদার জুর্দ্যাঁর হঠাৎ বহু টাকার মালিক হয়ে মাথা ঘুরে গেছে। তার একান্ত ইচ্ছে রাতারাতি অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার। রকমারি তার পোশাক। নাচ, গান, তলোয়ার চালানো,

তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা—প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারে আলাদা মাস্টার বহাল করেছে, সে যে কি রকম "পড়ানো" তা তো বুঝতেই পারছেন। মাস্টার-মশাইরা "পড়ানো"-র ফাঁকে কিঞ্চিৎ তৈলমর্দনও করেন।

ভাষা এবং তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষকের সঙ্গে জুর্দ্যাঁ-র কথোপকথনের একটুখানি নমুনা উদ্ধৃত করছি 'ভারতী'র ফাল্গুন সংখ্যা থেকে।

এ যুগের পাঠক নিজেরাই বিচার করুন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতি সাবলীল চলতি বাংলা লেখার ভঙ্গিটি।

'জুর্দ্যাঁ—একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে আপনার কাছে বলছি। একজন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে। আমি তাঁর পদতলে একটি প্রেমলিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখতে আমাকে সাহায্য করেন।

শিক্ষক—আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করেন?

জুর্দ্যাঁ—না না—পদ্য না।

শিক্ষক—তবে কি খালি গদ্য?

জুর্দ্যাঁ—না। আমি গদ্য-ও লিখতে চাইনে, পদ্য-ও লিখতে চাইনে।

শিক্ষক—হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে, এ দুটোর একটাও হবে না, তা তো আর হতে পারে না।

জুর্দ্যাঁ—গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

শিক্ষক—না মশায়, যা গদ্য নয় তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয় তাই গদ্য।

জুর্দ্যাঁ—যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

শিক্ষক—গদ্য।

জুর্দ্যাঁ—কি! যখন আমি বলি, 'নিকোল, আমার চটি জুতো নিয়ে এসো', এটা কি গদ্য হল?

শিক্ষক—হাঁ মশায়।

জুর্দ্যাঁ—মাইরি। আমি চল্লিশ বছরেরও বেশি গদ্য বলে আসছি অথচ গদ্য যে কি জিনিস তা আমি কিছুই জানিনে। আমি একটি পত্রে এই লিখতে চাই, 'সুন্দরী, তোমার সুন্দর চোখ দেখে আমি প্রেমে মরে

যাচ্ছি', এই কথাগুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে চাই।

শিক্ষক—লিখুন, তাঁর নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, তাঁর জন্য রাত্রিদিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

জুর্দ্যাঁ—না না না—ওসব চাইনে। আমি কেবল লিখতে চাই, সুন্দরী তোমার সুন্দর চোখ দেখে আমি প্রেমে মরে যাচ্ছি। আপনি বলুন দেখি ঐ কথাগুলো কত রকম করে বলা যেতে পারে?

শিক্ষক—'প্রেমে মরে যাচ্ছি সুন্দরী তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি' কিম্বা 'তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী মরে যাচ্ছি।' কিম্বা 'মরে যাচ্ছি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, সুন্দরী, প্রেমে।'

জুর্দ্যাঁ—কোনটা সকলের চেয়ে ভাল?

শিক্ষক—আপনি যেটা বলেছিলেন—'সুন্দরী তোমার সুন্দর চোখ দেখে আমি প্রেমে মরে যাচ্ছি।'

জুর্দ্যাঁ—তবু দেখ! আমি কখনও লিখতে পড়তে চেষ্টা করিনি—প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে অনুরোধ, কাল-ও সকাল সকাল আসবেন।'

এরকম আরো অনেক রঙিন রসোজ্জ্বল রচনা ছড়ানো 'ভারতী' মাসিক পত্রের এখানে ওখানে।

'ভারতী' উপলক্ষ্য করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে কি আনন্দ ও উত্তেজনাময় দিন-ই না গেছে! প্রথম সাতটি বছর যেন স্বপ্ন! এবং এই স্বপ্ন আর ওঁদের জীবনে কখনো ফিরে আসেনি।

একটি হলদে রঙের কাঠের বাক্স ছিলো 'ভারতীর ভাণ্ডার'—থাকতো নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কাছে। তিনিই ছিলেন 'ভারতী'র প্রাণ-প্রতিমা, সকল আনন্দের উৎস। 'ভারতী'র সেবকদের সাহিত্যচর্চা এই মূর্তিমতী দেবীকেই ঘিরে আবর্তিত হ'ত।

প্রতি রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আসতেন বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর মানিকতলার বাড়িতে। সেখানে অক্ষয়-চন্দ্র ও শরৎকুমারী (লাহোরিণী)—এই সাহিত্যপ্রাণ দম্পতির জমাট আসর। প্রধান আলোচনা, 'ভারতী'কে কিভাবে আরো ভালো করা

যায়, আড্ডা সেরে অক্ষয় চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে দুই ভাই যেতেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়ি। তারপর সেখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দুপুরে বাড়ি ফেরা।

ইতিমধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। কোনো কোনো বিকেলে তাঁর রামবাগানের বাড়িতেও 'ভারতী'র বৈঠক।

সস্ত্রীক অক্ষয়চন্দ্র ছাড়া, উপস্থিত থাকতেন নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ। নতুন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পড়া হতো, তারপর কিশোর রবীন্দ্রনাথের কিন্নর কণ্ঠের গান।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরতে রাত ১১টা।

নতুন বৌঠান জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদ সাজিয়েছিলেন ফুলগাছের টব দিয়ে। সে বাগানের নাম দেয়া হয় 'নন্দনকানন'। এ নন্দনকাননে 'ভারতী'র সেবকদের কেটেছে কতো অপরূপ সন্ধ্যা!

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাত্রা। বিলেত থেকে তিনি তাঁর যে অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান, তা 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের অভিজ্ঞতা' শিরোনামে মাসে মাসে ছাপা হয়। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ, একটানা ৯ সংখ্যা, ফাল্গুন সংখ্যা, এরপর ১২৮৭-র বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, ৪ সংখ্যা—মোট ১৪টি সংখ্যায়।

কৈশোরের লেখা এই ধারাবাহিক রচনাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব পরবর্তীকালে অত্যন্ত কঠোর ও বিরূপ হয়ে যায়। ৫১ বছর বয়সে তিনি খোলাখুলি মন্তব্য করলেন—"অশুভ ক্ষণে বিলাত যাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে 'ভারতী'তে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্য বয়সের বাহাদুরী। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস, শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশলাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎশক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায়—কাঁচা বয়সে একথা মন বুঝিতে চায়

না। ভালো লাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্বলতা, এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত, যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।"

পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ এটিকে অতি নির্মমভাবে কেটে-ছেঁটে দেন।

'য়ুরোপযাত্রী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবো কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের দুঃখের দীর্ঘশ্বাসও পড়বে যে এতো সুন্দর ও পাঠযোগ্য বিষয়বস্তু থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ যেরকম তেজী ও সাবলীল চলতি বাঙলায় পত্রগুলি লিখেছিলেন তা সে যুগের বিচারে আশ্চর্য তো বটেই, এমন কি এতোদিন পরেও নতুন করে পড়তে বসে মনে চমক জাগে।

যাঁরা ৯৯ বছরের পুরনো 'ভারতী'র পাতা থেকে সরাসরি পত্রগুলি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়-ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, সেগুলি বাঙলা সাহিত্যে আদৌ উপেক্ষার বস্তু নয়।

আর বিষয়বস্তু? বাঙালীর ঘরোয়া অথচ আটোসাঁটো সমাজ বন্ধন ছাড়িয়ে এক কিশোর পৌঁছেছেন সুদূর ইংলণ্ডে। সম্পূর্ণ পৃথক সেখানকার নরনারী, সমাজব্যবস্থা, পরিবেশ, হালচাল। বাঙালী কিশোর তাঁর এই বিচিত্র দেখা ও অনুভবকে যেমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর তখনকার মূল্যায়ন ও বিচারে কিছু ভুলত্রুটি ছিলো—কিন্তু সজীব তরুণ অনভিজ্ঞ ও কৌতূহলী মন নিয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে যেমন রূপ দিয়েছিলেন তার মাধুর্য কি এতোই ফেলে দেবার? আমরা তো মনে করি এগুলির টাটকা স্বাদ-ই আলাদা এবং সে স্বাদ যুগ এবং কালকে অতিক্রম করে তেমনি সতেজ রয়েছে।

ঐ পত্রগুলির কিছু অংশে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের গুরুতর মতবিরোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার দারুণ পক্ষে, দ্বিজেন্দ্রনাথ অতোটা পক্ষে নন। নতুন ও পুরাতনে মতভেদ, উদ্দাম কিশোরের বিরুদ্ধে প্রবীণ দার্শনিকের তাত্ত্বিক লড়াই।

রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপযাত্রীর কিস্তিগুলি যথারীতি ছাপিয়ে, যে যে বক্তব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের আপত্তি, তার তলায় দীর্ঘ দীর্ঘ ফুটনোটে উনি নিজের বক্তব্য জানিয়ে দিচ্ছেন। যথেষ্ট কড়া কথার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, নিজের মত থেকে নড়তে কেউ রাজি নন। অথচ ভাষার ওপর কি সংযম, একটিও বেচাল, শালীনতা-বহির্ভূত শব্দ নেই। এবং এ বিরোধ পাঠক মহলে-ও উৎসাহের সঞ্চার করে। 'ভারতী' কর্তৃপক্ষও কলম-যুদ্ধটি ঠিক-মতো চালিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট কর্মতৎপরতায় পরিচয় দেন।

সুদূর ইংলণ্ড থেকে জাহাজ-ডাকে লেখা আসা, দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ তা ছাপানো, তারপর সংখ্যাটি জাহাজ-ডাকে ইংলণ্ড পাঠিয়ে দেয়া এবং সেখান থেকে আবার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঠিক সময়মতো পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা।

কি যে জমেছিলো, তা বলার নয়।

চিত্তাকর্ষক তথ্য আরেকটু যোগ করি।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি পড়ে জোড়াসাঁকোর কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ বেশ ভয়ই পেয়ে যান। গোলমেলে ব্যাপার দেখছি! বিলেতের নতুন রকম ফ্যাসান, হালচাল দেখে রবি তবে কি বিগড়োবার রাস্তার দিকেই চলছে? মাত্র সতেরো বছরের ছেলে, মেমসাহেবদের সঙ্গে চলাফেরা ওঠা বসা—আচমকা এমন কিছু কাণ্ড ঘটাবে না তো, যাতে গোটা পরিবারের মাথা হেঁট হয়!

এমন কি অভিভাবকদের মধ্যে যাঁরা মনে করতেন, রবির মতো শান্ত সুভদ্র প্রকৃতির ছেলের কোনো আপত্তিজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পরা অসম্ভব এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত পত্রগুলির বক্তব্য সম্বন্ধে যাঁদের অভিমত ছিল অনুকূলে, তাঁরাও অবশেষে ক্ষণিক ইতস্ততের পর সিদ্ধান্তে আসেন—ঐ পরিবেশে রবির মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকে একলা থাকতে দিলে ঝুঁকির সম্ভাবনা নেহাৎ উড়িয়ে দেয়া যায় না।

অতএব মোটামুটি সকলেই ঠিক করলেন, রবির আর বিলেতে থেকে কাজ নেই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক।

রবীন্দ্রনাথকে অবিলম্বে ঘরে ফিরে আসার জন্য পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ

জরুরী চিঠি লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন, তাঁর প্রথম বিলেত বাস পর্বের ওখানেই ইতি।

পরবর্তীকালে ঐ ঘটনার স্মরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়জনদের কাছে মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টায় নানান মন্তব্য করতেন।

'বিলেত থেকে লেখা আমার চিঠি পড়ে বাড়ির অভিভাবকেরা ভাবলেন বিলিতি মেয়েদের হালচাল দেখে রবির মাথা ঘুরে গেছে। বাবামশাই ভাবলেন, রবি শেষে কি মেম বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে হাজির হবে! সর্বনাশ! তিনি আমাকে চিঠি লিখে তখুনি দেশে চলে আসতে বললেন। তারপর আমাকে একলাই ফিরে আসতে দেখে গুরুজনদের স্বস্তি।'

বিশ্বভারতী প্রকাশন সংস্থা 'ভারতী'র পাতা থেকে সম্পূর্ণ 'য়ুরোপ-যাত্রী' এবং সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের অম্লমধুর বক্তব্যগুলি একত্র করে বইটি ছাপেন না কেন, তা আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। তেমন কিছু মোটা বই তো নয়, দাম-ও কম রাখা সম্ভব। বহু উৎসাহী পাঠক, যাঁদের পুরনো 'ভারতী' পড়ার সুযোগ নেই, তাঁরা সংগ্রহ করে পড়ে খুশী নিশ্চয়ই হবেন। এ যে শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্তই নয়, এক হিসেবে সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি মূল্যবান পৃষ্ঠা।

'য়ুরোপ যাত্রীর' ভাষা সম্বন্ধে আরো একটি কথা যোগ করা যায়। ১৫ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথ' অনুবাদের সময়ে ডাইনীর মুখে যে দুর্দান্ত সচ্ছন্দ বাচনভঙ্গী বসিয়েছিলেন তা যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, 'য়ুরোপ যাত্রী'-র ভাষা-ই তার প্রমাণ। ভারতীর পাতা থেকে ডাইনীদের সংলাপ একটুখানি উদ্ধৃত করি, ১ম ডাকিনী—ঝড়বাদলে আবার কখন / মিলব মোরা তিনটি জনে।

২য় ডাকিনী—ঝগড়াঝাঁটি থামবে যখন/হার জিত সব মিটবে রণে.........

৩য় ডাকিনী—তুই ছিলি বোন কোথায় গিয়ে ?

১ম ডাকিনী—দেখ একটা মাঝির মেয়ে/গোটাকতক বাদাম নিয়ে/

খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে/কচ্‌মচিয়ে/কচ্‌মচিয়ে—/চাইলুম তার কাছে গিয়ে/পোড়ারমুখী বল্লে রেগে/"ডাইনী মাগী যা তুই ভেগে।"

দেড় বছর পর বিলেত থেকে ফিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ উদ্যমে 'ভারতী'তে নানা রকম লেখা লেখেন, তাঁর আরেকটি ধারাবাহিক উপন্যাস বৌঠাকুরানীর হাট ভারতীর পাতায় আত্মপ্রকাশ করলো ১২৮৮-র কার্তিক থেকে ১২৮৯-এর আশ্বিন পর্যন্ত। অন্যান্য লেখকেরা তো ছিলেনই। ভারতীর পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যায়, অন্যান্য আরো লেখক সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। ভারতীর সেবকেরা সকলেই বড়ো আনন্দিত. নিশ্চিন্ত।

এমন সময়ে সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সব কিছু। সাত বছরে তিলে-তিলে গড়ে ওঠা 'ভারতী'কে ছেড়ে চলে গেলেন সেই দেবী, ভারতী ছিলো যাঁর প্রাণ, যিনি ছিলেন ভারতীর ধ্রুবতারা। এতো সাধের মাসিক পত্রটি পিছনে ফেলে রেখে চিরদিনের মতো চলে গেলেন নতুন বৌঠান। (১৯ এপ্রিল, ১৮৮৪)।

আর এক মাসিকপত্র বার করে কি হবে? 'তত্ত্ববোধিনী'তে বিজ্ঞাপন-ও দিয়ে দেয়া হলো যে, 'ভারতী' আর প্রকাশিত হবে না, বৈশাখ সংখ্যা খানিকটা ছাপা হয়ে গিয়েছিলো, তা নষ্ট করে ফেলা হবে অবিলম্বেই। এমনই এক দারুণ দুর্যোগের দিনে আরেক মহিলা শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী'কে অব্যাহত রাখতে তিনি ইচ্ছুক, এর জন্য নিজের সম্পাদনায় একে চালিয়ে নিয়ে যেতেও তিনি পিছপা নন।

দীর্ঘ আলোচনার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্মতি জানালেন।

অতঃপর স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় পুনর্যাত্রা শুরু হলো ভারতীর, বড়ো বেদনাময় যাত্রা। শুরু হয়েছিলো যে অপূর্ব আনন্দ আস্বাদের মধ্য দিয়ে, তা অবলুপ্ত হয়ে গেছে নিঃশেষে। নিরাশার উৎসাহ-হীনতার অন্ধকার, এই অন্ধকার পথেই স্বর্ণকুমারীর সারথ্য!

কিন্তু নতুন বৌঠানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর প্রথম যুগ, সবচেয়ে স্বর্ণময় যুগ, শেষ হয়ে গেছে। ভারতীর পরবর্তী যুগের সঙ্গে সে

যুগের সুর তো আর কখনই মিলবে না!

১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'ভারতী'র সম্পাদনা শুরু করলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। বয়েস তখন তাঁর ঠিক ২৯।

তখনকার দিনে সাময়িকপত্রের প্রতি সংখ্যাতে নিয়ম করে সম্পাদকীয় লেখার প্রথা একেবারেই ছিলো না। কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে তবেই সম্পাদকীয় লেখা হতো।

নব পর্যায়ের 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতে নতুন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী যে চমৎকার ও আন্তরিক "ভূমিকা" লিখলেন তার একটুখানি শোনা যাক।

"এই পত্রিকায় এবার ভূমিকা শীর্ষক রচনাটি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—'ভারতী'র আবার ভূমিকার প্রয়োজন কি? 'ভারতী' স্বীয় পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন সত্য বটে, কিন্তু 'ভারতী'র জীবনে যে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা পাঠকমণ্ডলীকে আমাদিগের জ্ঞাত করাইতে হইতেছে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদামহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।

'ভারতী' এতদিন যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্টরূপে ইহা সম্পাদন করা দুর্ঘট, সে আশা দূরে থাক, 'ভারতী'র পূর্বপ্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু কেবল এই আশার বশবর্তী হইয়া যে আমরা ভারতী গ্রহণ করিয়াছি এমন নহে, কিম্বা এতদিন এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকায় ইহার প্রতি যে মমতা জন্মিয়াছে—সেই মমতাও আমাদের এ গুরুভার গ্রহণ করার প্রধান কারণ নহে। আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দররূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্যবশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সেই নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন 'ভারতী' উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল,

আমাদের দেশের এবং বাঙালা ভাষায় বর্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একদিন পত্রিকার অকালমৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি।

মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় কন্যা গভীর দুঃখে অশ্রুজল ফেলিতে থাকেন, তাঁহার পিতামাতা স্বজনবর্গও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সাধের প্রতিমা পরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—তাঁহাদের মত যত্ন আদর তাহাকে আর কে করিবে! কিন্তু শ্বশুরালয়ে আসিয়া কন্যা যখন দেখিতে পায়—এখানেও তাহাকে আদর করিবার, এখানেও তাহাকে যত্ন করিবার লোক আছে, এখানেও তাহার মলিন মুখ দেখিলে প্রাণে ব্যথা পাইবার লোক আছে, তখন সেই যত্নে সেই আদরে কন্যা ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠে এবং কন্যাকে সুখী দেখিয়া কন্যার পিতামাতা আত্মীয়বর্গও তখন সুখী হইয়া থাকেন। 'ভারতী'র সম্বন্ধেও আমরা পাঠকদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি যে 'ভারতী' আমাদের হাতে অযত্নে পড়িবেন না। ভারতীর পূর্বতন বন্ধুগণ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতেন আমরাও 'ভারতী'র জন্য সেরূপ শ্রম স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব। আর এক কথা —কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পিতামাতা তাহার পর হইয়া যান না, তাঁহারা পূর্বেও যেমন আপনার ছিলেন এখনও তেমনি থাকেন, পূর্বেও স্নেহ করিতেন এখনও তেমনি স্নেহ করেন—সেরূপ 'ভারতী' হস্তান্তরিত হইল বলিয়া পূর্বতন বন্ধুদিগের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ রহিত হইল না। তাঁহারা পূর্বেও ইঁহাকে যেরূপ যত্ন করিতেন, এখনও ইঁহাকে সেরূপ যত্ন করিবেন। সুতরাং অন্য গৃহে আসিয়াও পাঠকদিগের নিকট ইনি সেই পূর্বের 'ভারতী'ই রহিলেন।"

এই বছরের 'ভারতী'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা অবশ্যই তরুণ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প "ঘাটের কথা"।

তা ছাড়া তাত্ত্বিক খুঁটিনাটির প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাময়িক মতভেদের সাক্ষীও এ বছরের 'ভারতী'।

ব্যাপার হলো এই, বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে "প্রচার" নামে একখানি ছোট আকারের মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন [যদিও সম্পাদকরূপে তাঁর নাম দেওয়া হতো না]। 'প্রচারের' শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের তত্ত্বগত কিছু খুঁটিনাটিতে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট আপত্তি ছিলো। তাই তিনি 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "একটি পুরাতন কথা" নামে প্রবন্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান, পুরো ১০ পাতার এ প্রতিবাদ প্রবন্ধ অবশ্য ঈষৎ কাঁচা, প্রচুর ভাবাবেগ, এবং সেই জন্য বক্তব্যও হয়ে গেছে খানিকটা এলোমেলো, কিন্তু খুব আন্তরিকভাবে লেখা এবং অশালীন বা বিদ্বেষমূলক কোনো মন্তব্য ছিলো না আদৌ।

"একটি পুরাতন কথা" প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হলো যে, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছেন রবীন্দ্রনাথ। অতএব সেই অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রচারে' তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন "আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নবহিন্দু সম্প্রদায়"। এ লেখাটি পড়ে পরের মাস পৌষ সংখ্যার ভারতী-তে "কৈফিয়ত" শীর্ষক জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এটিও প্রায় ৮ পাতার বড় প্রবন্ধ। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ "আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে 'একটি পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের 'প্রচারে' 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নবহিন্দু সম্প্রদায়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর কতকগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়।" তারপর লিখলেন, "তিনি আমার গুরুজনতুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড় ? আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে ? তাঁহার প্রথম সন্তান 'দুর্গেশনন্দিনী' বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা।" প্রবন্ধটি শেষ করলেন এইভাবে—"বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো

আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।”

বলা বাহুল্য যে, উভয় পক্ষের মতবিরোধের এখানেই ইতি। রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্নেহাশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। বিরোধের সময়সীমা, মাত্র দু মাস, পরবর্তী মাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘প্রচার’ মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথ কবিতা দিলেন, এবং ‘ভারতী’ মাসিকপত্রের লেখক-গোষ্ঠীর তালিকায় ওঁর নিজের নাম বিজ্ঞাপিত করার অনুমতি দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি। বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘কৈফিয়ত’ প্রবন্ধটি পৌষ সংখ্যার ‘ভারতী’র ঠিক যেখানে শেষ হয়েছে, সেই পাতাতেই ছাপা হয়েছে ‘কোথায়’ নামে একটি কবিতা। লেখকের নাম নেই। কিন্তু আমরা জানি ও কবিতা তরুণ রবীন্দ্রনাথের, একটুখানি উদ্ধৃত করি—“হায়, কোথা যাবে !/অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি/পথ কোথা পাবে !···মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,/শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় !/মহা সে বিজন মাঝে/হয়ত বিলাপধ্বনি মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,/·· স্নেহের পুতলি তুমি/সহসা অসীমে গিয়ে/কার মুখ চাবে !/ হায় কোথা যাবে।”

স্পষ্টতই এটি নতুন বৌঠানকে স্মরণ করে লেখা। মূর্তিমতী লক্ষ্মী সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন ৮ মাস আগে। সেই পবিত্র স্মৃতির স্মরণে ‘ভারতী’র পাতায় প্রকাশ্যে এই প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনায় ‘ভারতী’ দিব্যি এগিয়ে চলছে, পাতার সংখ্যা বেড়ে যায়, গ্রাহকও বাড়ে। এই সময় থেকেই ‘ভারতী’র ঘরোয়া ভাবটি ক্রমেই মুছে যেতে থাকে। বাইরের লেখকরা লেখবার সুযোগ বেশি পেলেন। এমন কি বহু নতুন লেখকের হাতেখড়িও হলো মাসিক পত্রটিতে, কোনো কোনো মাসে এও দেখা গেছে যে দুটি মাত্র লেখা ঠাকুর পরিবারের কারুর—তাছাড়া বাকি সব লেখা বাইরের লেখক-লেখিকাদের।

স্বর্ণকুমারী একেবারে সাফ জানিয়েছিলেন, তাঁর মতের সঙ্গে মিল থাক আর নাই থাক, লেখা যোগ্য হলেই তা ভারতীতে স্থান পাবে, কারণ জ্ঞানের পুষ্টিসাধনের জন্য এক-একটি প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে, তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে, নানা ভাবে দেখা দরকার।

ফলে, বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে 'ভারতী' বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠলো তৎকালীন নানা সামাজিক ব্যবস্থা-কুব্যবস্থা নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে লেখকেরা পক্ষে-বিপক্ষে যে সব মতামত দিয়ে গেছেন, তা এক কথায়, সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল।

ইংরেজের সংস্পর্শে এক নতুন চেতনা আসতে শুরু করেছে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে—আসছে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক নতুন ভাব-ধারা তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক কুপ্রথার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে বাঙালী উৎসুক, আবার সংস্কারের গোপন বাধা অতিক্রম করাও কঠিন। দুয়ের টানা-পোড়েনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতিরোধ। 'ভারতী'তে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে আছে সেই ইতিহাস। নতুন করে 'ভারতী'র পুরনো ফাইলগুলি পড়তে পড়তে গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি আমরা। সেদিনকার এক-একটি পদক্ষেপ যে কতো কষ্টসাধ্য ছিলো তা আজ হয়তো অনেকেরই অজানা।

প্রশ্ন মনে জাগে, কেমন সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী? বাংলা সাময়িকপত্র জগতে প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকদের তালিকায় তিনি স্থান পাবেন না সে-কথা ঠিক। মাঝামাঝি দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায়। সম্পাদিকারূপে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন এ তথ্যটি অবশ্যস্বীকার্য। 'নাম কা ওয়াস্তে' সম্পাদিকা তিনি ছিলেন না। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ধরনের লেখা ফুলের তোড়ার মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরার কায়দাও জানতেন। মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো সংখ্যা সম্পাদনার দোষে খাপছাড়া হলেও মোটের ওপর তিনি সফল সম্পাদক।

স্বর্ণকুমারীকে মাঝামাঝি দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পাদিকা বলে তাঁকে আমি আদৌ ছোট করিনি। বাংলা মাসিক পত্রের প্রথম শ্রেণীর

সম্পাদকের সংখ্যা যেমন আঙুলে গুনে বলা যায়—দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পাদকের সংখ্যাও মোটেই বেশি না। বরং খুবই কম। অধিকাংশই তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর। সেই হিসেবে বাংলা মাসিক পত্রের প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পাদকের একটু নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পাদকরা আদৌ হেলাফেলার নন—বরং যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন, যথেষ্ট শ্রদ্ধেয়।

লেখিকা ও সম্পাদকরূপে স্বর্ণকুমারী অনেক পুরুষের চেয়ে ঢের ঢের কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন একথা যেমন ঠিক, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো যথার্থ প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীকে যে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না কোনোমতে, সে কথাও ঠিক। এমন কি ঐ দুই কীর্তিমান সম্পাদকের খানিকটা নীচে যাঁর স্থান এবং (কয়েকটি মারাত্মক দোষত্রুটি ও পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও) যাঁকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক বলে মনে করি—সেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ('সাহিত্য' মাসিকপত্র সম্পাদক) সঙ্গেও স্বর্ণকুমারী তুলনীয়া নন—স্বীকার করে নেয়া ভালো।

বাংলা মাসিকপত্রের তিনিই কি প্রথম মহিলা সম্পাদক ? অবশ্য গবেষক ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তিনি দ্বিতীয়া। কারণ স্বর্ণকুমারীর আগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থাকমণি দেবী নামে এক মহিলা 'অনাথিনী' নামে এক মাসিকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন।

নিছক তথ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে কথাটা না হয় ঠিক, কিন্তু তাহলে সেই সঙ্গে তো আরো দু-চারটি কথা মনে এসে যায়। যেমন, অতি ক্ষণস্থায়ী মাসিকপত্র 'অনাথিনী'র সঙ্গে 'ভারতী'র স্ট্যাণ্ডার্ডের কোনো তুলনা হয় না এবং উভয় সম্পাদিকার দায়িত্বের ভার-এর প্রচুর তারতম্য। তাছাড়া শ্রীমতী থাকমণি দেবী কি সত্যিই সম্পাদনার কঠিন কাজ চালিয়েছেন, না কি তাঁর নামটি দিয়েই তিনি খালাস—এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুবই মুশকিল। মানে, পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি ও ব্যাপারে।

অবশ্য, ঐতিহাসিক তথ্যরক্ষার খাতিরে থাকমণি দেবীর নাম উল্লেখ

করা উচিত, সে কথা আমরাও মানি।

দু দফায় [প্রথমবার ১২৯১—১৩০১ বঙ্গাব্দ ও দ্বিতীয়বার ১৩১৫ —১৩২১ বঙ্গাব্দ] মোট ১৮ বছর 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্বভার বহন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী, ৫০ বছর স্থায়ী মাসিকপত্রটির তিনিই সবচেয়ে বেশি সময়ের সম্পাদক।

"সম্পাদক" কথাটা শুনতে খুব ভালো। কিন্তু ঝামেলাও অনেক। যেমন এডিটিং জিনিসটা। বহু লেখা পড়তে গিয়ে দেখা গেল মোটের ওপর উৎরোলেও গণ্ডগোল রয়েছে কোনো কোনো জায়গায়। ভাষার দোষই হোক, অবান্তর প্রসঙ্গে ঈষৎ এলোমেলোই হোক, বা অন্য কোনো রকম গোলমাল। সেগুলো ছেঁটে-কেটে দিলে লেখাটা বেশ দাঁড়াচ্ছে।

এক্ষেত্রে সম্পাদকের করণীয় কি? কঠিন হাতে কাঁচি চালানো? সেটাই উচিত—কিন্তু স্বর্ণকুমারী দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকের যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তা পরবর্তীকালের সাময়িকপত্র সম্পাদকদের জানা ছিলো নিঃসন্দেহে কিন্তু সকলের পক্ষে সেটি অনুসরণ করা কি আর সম্ভব?

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই ছিলেন কড়া এডিটিং-এর পক্ষপাতী। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, মাত্র তার কয়েক বছর পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নবীন মাসিকপত্র সম্পাদকের যে খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছিলো তা এই প্রসঙ্গে শোনা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল তোমরা সম্পাদকেরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না?

তটস্থ নবীন সম্পাদক বলেন, আজ্ঞে কেন ওকথা জিজ্ঞেস করছেন?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, অনেক লেখা পড়ে মনে হয় একটু অদল-বদল করলে, কেটে-ছেঁটে দিলে বেশ হয়, তবে কেন কর না? লেখকরা কি রাগ করেন?

নবীন সম্পাদক জবাব দিলেন, আজ্ঞে আমরা পারি না, জানিও না, পরিচিত লেখকদের লেখা অবশ্য একটুখানি এডিট করে দিই। তার—

পরেও এরকম থেকে যায়। সকলের লেখা কাটাকাটি করতে সাহসও হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কেমন-ভাবে কাজ চলবে? এই জন্যই তো বঙ্গদর্শনের আমলে আমাকে বড্ড খাটাখাটনি করতে হতো। আমি খুব ভালো ভাবে 'রিভাইজ' না করে কারো কপি প্রেসে দিতাম না। বহু লেখকের বহু লেখা আমি মেজে-ঘষে দিয়েছিলাম। কিন্তু কই—আমাদের সময়ে এজন্য কোনো লেখক তো রাগ করতেন না।

—আজ্ঞে আপনার কথা আলাদা।

—কিসের আলাদা? ও কোনো কাজের কথা নয়। চেষ্টা করেই দেখ একবার। পরিশ্রমকে ভয় করো না।

—আজ্ঞে আমরা পারবো কেন?

—কেনই বা পারবে না? অসুবিধে কিসের? নিজের ওপর তোমার কি কোন বিশ্বাস নেই? সম্পাদকের কর্তব্য এড়িয়ে যেতে চাও?

গতিক বিশেষ সুবিধের নয় বুঝে বেচারা নবীন সম্পাদক অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কথা ঘুরিয়ে দিলেন।

তা স্বর্ণকুমারীর জানতে বাকি ছিলো না যে তিনি বেশি কাটাকুটি করলে লেখকেরা রাগ করবেন নির্ঘাৎ এবং অনেক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তাই তিনি অন্য রাস্তা নিলেন। যে যে লেখা কিছু বদলালে ঠিক হবে মনে করতেন সেই সেই লেখা লেখকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে সঙ্গে একখানি 'সবিনয় নিবেদন' চিঠি মারফৎ জানাতেন যে, ঐ লেখা প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছে—কিন্তু এই জায়গায় এই আপত্তি—লেখক মহাশয় যদি সেগুলি সংশোধন করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে ছাপার আর কোনো বাধা থাকবে না।

পদ্ধতিটি ভালো। লেখকদের সহযোগিতা ঠিকমতোই পাওয়া গেলো। স্বর্ণকুমারীর আর কোনো অসুবিধে হয়নি।

পরবর্তীকালে বাংলা সাময়িক পত্রের বহু সম্পাদক ওঁর এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে আরো দু-চারটি কথা বলতে ইচ্ছে হয়। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের এক অমর ব্যক্তিত্ব। ভারতী মাসিক পত্র আঠারো বছর সম্পাদনা করা ছাড়াও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সেবা করে গেছেন নানাভাবে। এবং তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

ডাকসাইটে সুন্দরী যাকে বলে। দুধেআলতা রং, আয়ত চোখ, টানা নাক, পাতলা ঠোঁট, মাথায় একঢাল কালো চুল, নিখুঁত গঠন। চলন বলন ব্যবহারে নিভুর্ল আভিজাত্য—সব মিলিয়ে সে মহিমান্বিত রূপ দর্শকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিত। পরবর্তী জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন, ব্যক্তিগত শোকতাপ আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে, তবু সে মহিমান্বিত রূপ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

পঁচাত্তর বছর বয়েসে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৩০ খ্রীঃ) মূল সভাপতিরূপে তিনি যখন ডায়াসে উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে দেখে উপস্থিত বিশাল জনতার মনে একটি মাত্র উপমাই এসেছিলো—কুইন—মহারানী ভিকটোরিয়া।

ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য-সঙ্গীতের দিকে খুব ঝোঁক, এবং তাঁকে সবচেয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নানা বিখ্যাত ইংরেজী ও ফরাসী গল্প বাংলায় তর্জমা করে শুনিয়ে বোনকে বলতেন, এবার তুমি নিজে একটা গল্প লিখে নিয়ে এস।

পিয়ানোর সুর তুলে বোনকে বলতেন, এই সুরে মিলিয়ে একটা গান লিখো।

সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথও এ পদ্ধতিতে বহু গান লিখেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছ বছরের বড়ো ছিলেন স্বর্ণকুমারীর চেয়ে, আবার, স্বর্ণকুমারী ঐ ছ বছরেরই বড়ো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের।

'ভারতী'কে অবলম্বন করেই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যজীবন প্রসারিত হয়। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম উপন্যাস লেখেন, বৈজ্ঞানিক তথ্য-বহুল প্রবন্ধ লেখাতেও তিনিই প্রথম মহিলা। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'পৃথিবী' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে

প্রভূত সাড়া জাগায়। পরে এটি গ্রন্থাকারে বার হয়েছিল। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম গীতিনাট্য (বসন্ত উৎসব) লেখেন। নানা রকম লেখা যথেষ্ট লিখে গেছেন তিনি। বইয়ের সংখ্যা পঁচিশ।

তাঁর সব চেয়ে মুস্কিল যে তিনি রবীন্দ্রনাথের দিদি। ওঁর দিদি না হলেই ভাল হতো! ছোটো ভাইয়ের অকল্পনায় প্রতিভার আড়ালে তিনি ঢাকা পড়ে গেলেন। নইলে, এ যুগের পাঠক তাঁর লেখা পড়ে প্রশংসা করার মতো অনেক কিছুই খুঁজে পেতেন। উপন্যাসে ঝরঝরে ভাষা, স্বচ্ছ সংলাপ, চাপা হাস্যরস, আটপৌরে সাদামাটা চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা এবং প্রবন্ধে নিজের বক্তব্য পরিপাটি গুছিয়ে বলার কায়দা বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিককার উপন্যাস অবশ্য তেমন সামলাতে পারেন নি। একে তো ভাবপ্রবণতা, কাব্যময় ভাষার প্রয়োগের একটু বাড়াবাড়ি ছিলো। তাছাড়া ঘটনার পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে পড়লে, সে যুগের পদ্ধতি অনুযায়ী, এক রহস্যময়, শক্তিমান ও ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী হাজির করে মুস্কিল আসান করেছেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁর লেখার উন্নতি হয় এবং দোষ-ত্রুটি কমে রীতিমতো বাস্তব-ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

সেযুগের শ্রেষ্ঠ তুজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তবে বুক ঠুকে নির্দ্বিধায় আমরা শরৎকুমারী চৌধুরানী (লাহোরিনী) ও স্বর্ণকুমারীর নাম করবো। সত্যি কথা বলতে কি, তখনকার অনেক পুরুষ লেখকের চেয়ে এঁরা অনেক ভালো লিখতেন।

এই তুই লেখিকার মধ্যে গুণগত তারতম্যে শরৎকুমারী চৌধুরানী (লাহোরিনী)-র স্থান পয়লা নম্বর। তিনি আরো শক্তিময়ী লেখিকা। তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, জোরালো চলতি ভাষা এবং নানান ধরনের চরিত্র আঁকবার নৈপুণ্য দেখে তাক লেগে যায়। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন ও মহিলা সমাজের যে জীবন্ত চিত্র কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আশ্চর্য। যদিও উদাসীন প্রকৃতির হওয়ায় খুব বেশি লিখে রেখে যেতে পারেন নি। এবং বহু লেখাই লেখবার পর অবহেলাভরে কোথায় যে ফেলে রেখে দিতেন, তার খোঁজও পাওয়া যেত না। তিনি অতিশয় স্বামীপরায়ণা মহিলা

ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী অক্ষয়চন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যুতে তিনি মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে বিধবা হন। এরপর থেকে লেখা ছাপানো এবং নিজের নাম প্রকাশ করার দিকে তাঁর ঔদাসীন্য আরো অনেক বেড়ে গেল। যাই হোক, 'ভারতী' মাসিকপত্র মারফৎ এই দুই মহিলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের যে মর্যাদার আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালের মহিলা লেখকদের পদক্ষেপকে সহজতর করেছে।

একটানা এগার বছর 'ভারতী' সম্পাদনা করে স্বর্ণকুমারী সাময়িকভাবে অবসর নিলেন। সম্পাদনার ভার তুলে দিলেন তাঁর দুই মেয়ে হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর হাতে। ১৩০২ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৪—এই তিন বছর দুই বোনে 'ভারতী' চালান। মোটামুটি ভাবে এঁরা মায়ের প্রদর্শিত পথেই এগিয়েছেন। নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন নি, নতুন কোনো বিভাগও খোলেন নি। সম্পাদনার ভার স্বর্ণকুমারী নেয়ার পর থেকে মোটামুটিভাবে এই সময় পর্যন্ত 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর একটু খোঁজ নেয়া যাক। প্রতিষ্ঠিত, আধা প্রতিষ্ঠিত ও নতুন লেখক/লেখিকা মিলিয়ে প্রায় ৬৬ জন কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। নতুনদের সকলেই যে উঁচুদরের কিংবা ভালো লেখক ছিলেন এমন কথা নয়, কিন্তু চলনসই লেখার ক্ষমতা সকলেরই ছিলো এবং তাঁদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁয়াটুকু অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। নতুনদের মধ্যে ছিলেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বনোয়ারিলাল গোস্বামী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ।

এঁদের ভেতরে তিনজন সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সত্যিই ভালো লেখক। নামও যথেষ্ট করেছিলেন। 'ভারতী'-তে প্রচুর লিখেছেন। 'ভারতী'র পাতায়

ওঁর ধারাবাহিক সামাজিক উপন্যাস "লীলা" সেযুগে খুব জনপ্রিয় হয়। ওঁর নিজেরও সামাজিক উপন্যাস লিখে নাম করার দিকে ঝোঁক ছিলো। কিন্তু তিনি ভুল পথে উলটো রাস্তায় গিয়েছিলেন। সামাজিক উপন্যাসে নয়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের আসল ক্ষমতা ছিলো 'গথিক' উপন্যাস লেখায়। লেখেন নি, কিন্তু লিখলে তিনিই পারতেন। ছমছমে নির্জন প্রাসাদ, আধো আলো আধো অন্ধকার, রহস্যময় চরিত্রের আনাগোনা এবং নানা বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব তিনি যে যে লেখায় এনেছেন, তা শুরু করা মাত্র জমে উঠেছে দারুণ। কিন্তু ঐ যে বললাম, এসব লেখায় ওঁর মনোযোগ না থাকাতে যেমন তেমন করে শেষ করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ও রোমান্স পটভূমিকা নিয়ে কতোগুলি চমৎকার গল্প লেখেন। চোস্ত রম্যরচনা লেখাতেও তাঁর খুব হাত ছিলো। যদিও ইনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু ওঁর লেখায় রবীন্দ্র-প্রভাব কোনো সময়েই পাওয়া যায় নি। কারণ উনি ছিলেন পুরোপুরি ভাবে বঙ্কিম আদর্শ ও ঘরানার সাহিত্যিক।

জলধর সেন 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র সম্পাদক হিসেবেই অমর হয়ে আছেন। কিন্তু সম্পাদক জীবন শুরু করার আগে তিনি ভ্রমণকাহিনী লেখকরূপে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে 'ভারতবর্ষ' কর্তৃপক্ষ ওঁর শূন্যস্থানে তড়িঘড়ি জলধর সেনকেই যে সম্পাদক নির্বাচন করেন, তাঁর মূলে অনেকটাই ছিলো সেন মহাশয়ের ভ্রমণকাহিনী লেখার নামডাক। ব্যাপার হলো এই—মা, স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুতে মর্মাহত জলধর সেন একেবারে তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয় ও তার আশেপাশে কয়েক বছর পর্যটন করেন। তারপর সন্ন্যাসজীবন শেষ করে লোকালয়ে ফিরে এসে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি কিস্তি 'ভারতী'তে পাঠান। প্রকাশ হওয়া মাত্র তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে খুব উৎসাহ দেন। অতঃপর ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল ওঁর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। চলতি বাংলায় একেবারে ঘরোয়া আটপৌরে ভঙ্গী। সুন্দর সুন্দর কুমারী তরুণী বিধবার হঠাৎ আবির্ভাব ঘটিয়ে লেখা সরস করার

আদৌ কোনো চেষ্টা না করে ফটোগ্রাফিক কায়দায় নিপুণ নিছক ভ্রমণ-বর্ণনাই করে গেছেন। দোষের মধ্যে রান্না এবং খাওয়ার বর্ণনা খানিক বেশি এই যা। যাই হোক, তাতে কোনো রসভঙ্গ হয়নি তেমন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতো শক্তিশালী সাহিত্যিক 'রবার্ট ব্লেকে'র আড়ালে চাপা পড়ে রইলেন, তা যে কতো দুঃখের কি বলবো! 'ভারতী'-তে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনী "পট" নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হবার পর "অজয় সিংহের কুঠি" নামে তাঁর আরেকটি গোয়েন্দা উপন্যাস বাজারে বার হয়ে জনপ্রিয়তা পেলো। তাৎক্ষণিক খ্যাতি ও অর্থের মোহ সম্ভবত তিনি এড়াতে পারেননি। গোয়েন্দা-কাহিনীর দিকেই ক্রমে চলে গেলেন। অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে জীবৎকালে জনপ্রিয়তা পান। কিন্তু তাঁর সত্যিকারের গুণের কদর আদৌ হয় নি। বাংলার পল্লীজীবনের ওপর তিনি যে অনেকগুলি রম্যরচনা বা নকশা লিখে গেছেন, তার তুলনা আছে কি? আমরা তো মনে করি—তুলনা নেই! প্রধানত 'ভারতী' এবং তাছাড়া অন্য সাময়িক পত্রেও তাঁর পল্লী-জীবনের ওপর নকশা সেযুগের অনেক রসজ্ঞ পাঠকের এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগে। 'সাধনা'র জন্য নিজে চেয়ে নিয়ে-ছিলেন দীনেন্দ্রকুমারের লেখা। অনবদ্য এই রম্যরচনাগুলি যদি দুটি বা তিনটি খণ্ডে আবার এখন বই আকারে ছাপা হয়, তাহলে এ যুগের পাঠক নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বাংলা সাহিত্যের একটি লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার হলো।

দুই বোনের সম্পাদনার শেষ বছরের মাঝামাঝি থেকেই শোনা গেলো রবীন্দ্রনাথ নাকি সামনের বছর থেকে 'ভারতী'-র হাল ধরবেন। কথাটা পাকাপাকি হয়ে যায় মাঘ মাসে। এবং চৈত্র সংখ্যার শেষে হিরণ্ময়ী দেবী 'ভারতী'-র কাছে বিদায় চাইলেন একটি সরল ও মর্মস্পর্শী কবিতা মারফৎ। পড়লে আর সন্দেহ থাকে না যে, এই পরিবারের সকলের কাছে 'ভারতী' ছিলো কতোখানি! একটু উদ্ধৃত করি—"রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার/তবু রব কাছে,/যদি নিভে যায় হাসি,/ম্লান হয়ে আসে রূপ,/কোলে তুলে নিয়ে/যতনে মুছায়ে দিব অশ্রুজল রাশি।/এ

নহে বিদায়/এ তো নহে ছাড়াছাড়ি,/এ যে শুধু ভালবাসা-ব্রত-উদ্‌যাপন;/ কি বিপদে কি সম্পদে ছায়ার মতন/সাথে থাকি চিরদিন করিব অর্চন।"

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিলো হিরণ্ময়ীর। জীবিত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে 'ভারতী'-র ছাড়াছাড়ি হয়নি। 'ভারতী' থাকাকালীন তিনিই চিরদিনের মতো চলে গিয়েছিলেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী'-র পুনর্যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন সাঁইত্রিশ। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে একটা খুব গোলমেলে ব্যাপার বলে নিতে হয়। সম্পাদনা গ্রহণ করার আগের পুরো দশ বছর (১২৯৫ বঙ্গাব্দ—১৩০৪) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র-র পাতায় এতো কম লিখলেন কেন? কি কারণ ছিলো?

'ভারতী'-র প্রথম পর্বে (প্রথম সাত বছর) রবীন্দ্রনাথই প্রধান লেখক ছিলেন—সব চেয়ে বেশি লিখেছেন—সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করে নিয়েছি। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরও তিন বছর—প্রথম পর্বের মতো অতোখানি না হলেও—রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরই দ্রুত কমে এলো।

মাসে বারোখানি করে সংখ্যা তো বার হয়েছে, অথচ রবীন্দ্রনাথ গোটা বছরে লেখা দিয়েছেন একটি। বড়জোর দুটি। মধ্যে এক বছরে তো একটিও না।

প্রকৃত উত্তর কি, তা কখনো জানা যায়নি, হয়তো জানা যাবেও না। আমাদেরও এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট মতামত নেই। অনেকে বলেন, 'সাধনা' মাসিকপত্র নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই 'ভারতী'-তে লেখা দেয়া সম্ভব হয়নি।

একেবারে বাজে কথা। 'সাধনা' তো চলেছিলো মাত্র চার বছর, বাকি বছরগুলিতে কি হয়েছিলো? তাছাড়া, তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন প্রচুর লিখছেন, দু হাতে লেখা যাকে বলে, ইচ্ছে করলে অনায়াসে যথেষ্ট লেখা দিতে পারতেন 'ভারতী'-কে, এমন কি সাধনা-তে লেখা দেয়া বজায় রেখেও! রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন সে-সব আদৌ কোনো সমস্যাই নয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কিংবা তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো রকম মতবিরোধের প্রশ্নই দেখা যায়নি, সম্পর্ক খুব মধুর ছিলো। তাছাড়া পূর্ববঙ্গে জমিদারীর কাজে যাওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকতেন। আর কলকাতার বাইরে গেলেই বা, লেখা পাঠানোর সমস্যা কোথায় ?

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ তো শুরু করলেন সম্পাদনা। মাত্র এক বছর তিনি এ দায়িত্বভার বহন করেছিলেন। এবং এই বছরের 'ভারতী'-তে প্রচুর উঁচুমানের লেখা বার হয়েছিলো।

বলা বাহুল্য যে ঐ লেখাগুলির অধিকাংশই ছিলো তাঁরই। এতো বছর চুপচাপ থাকার পর 'ভারতী'-তে তিনি নানা বিষয়ে প্রচুর লেখা যেন ঢেলে দিলেন। গোটা বছরে 'ভারতী'-তে সর্বমোট ১২৬টি রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো, আর তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একাই লিখলেন ৫৬টি। সোজা কথায় ভারতী-র পর পর বারোটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ছাপ্পান্নটি লেখা। সংখ্যাটা এযুগে আমাদের অনেককেই অবাক করবে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে অনেকগুলিই তো বিখ্যাত হয়েছিলো পরবর্তীকালে। কিছু নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। ছোটো গল্প— ১। দুরাশা ২। অধ্যাপক ৩। ডিটেকটিভ। ৪। দৃষ্টিদান ৫। পুত্রযজ্ঞ। ৬। রাজটিকা ৭। মণিহারা।

প্রবন্ধ—১। কণ্ঠরোধ ('সিডিসান' বিল পাশ হবার আগের দিন টাউন হল মিটিংএ পঠিত) ২। গ্রাম্য সাহিত্য ৩। বিদ্যাসাগর ৪। চাটুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে ৫। বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ।

কবিতা—১। জুতা আবিষ্কার (কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়') ২। দেবতার গ্রাস (গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে) ৩। বর্ষামঙ্গল (ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে) ৪। দুঃসময় (যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে) ৫। মদন ভস্মের পূর্বে (একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে) ৬। মদন ভস্মের পর (পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী) ৭। স্বপ্ন (দূরে বহু দূরে। স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে) ৮। ভাষা ও ছন্দ (যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে

আষন্ন আষাঢ়) ৯। বিদায়কাল (ক্ষমা কর, ধৈর্ব ধর, হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ) ১০। হতভাগ্যের গান (কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।) ১১। বর্ষশেষ (ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ-বেগে ধেয়ে চলে আসে) এবং ১২। কাব্যনাট্য 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পাঠকদের সমাদর পায়নি। গ্রাহক সংখ্যা তথা বিক্রি আদৌ বাড়ে নি। অনবদ্য রচনাগুলি পড়ে মুগ্ধ বাঙালী পাঠক ভারতী-র দিকে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিলেন —তেমন পরিস্থিতি ঘটলো আর কই। সেযুগে রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী-দের চেয়ে বিরোধীরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন সেকথা আমরা জানি। বিরোধীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সচেতনতা বাঙালী পাঠকের মধ্যে সেদিন খুব বেশি দেখা যায় নি। ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। কিন্তু সংখ্যাটা অতো বাড়েনি যে, খালি তাঁদের আনুকূল্যেই একটি মাসিকপত্রিকা ভালো-ভাবে চালিয়ে নেয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিরাশ এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। চৈত্র মাসের শেষ সংখ্যায় তিনি যে সম্পাদকীয় লিখলেন তা ঈষৎ কৌতুকের ভঙ্গীতে রচিত হলেও লেখাটির মধ্যে বেদনার অস্পষ্ট আভাস এযুগের সতর্ক পাঠকের কান এড়িয়ে যাবে না মনে করি। সম্পাদকের দায়িত্বভার থেকে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেওয়ার সঙ্গেই 'ভারতী'-র দ্বিতীয় যুগ বা মধ্য পর্বের অবসান হয়ে গেল। এবার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি শুনুন—

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল ত্রুটির যত কিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা, চেষ্টা, আধিব্যাধি, ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্মা হইয়া কর্ণধারের মত পত্রিকার চূড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র-সম্পাদন হাল-গরুর দুধ দেওয়ার মত —সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান দিতে হয়;—তাহাতে পরমধৈর্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই—অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায়সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প—অথচ চাল বিলাতী, নিয়ম অত্যন্ত কড়া;—সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শরীর-ধর্মবশতঃ কম্পোজিটরের রোগ-তাপও ঘটে এবং প্লেগের গোল-মালে ঠিকা লোক পাওয়াও দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্রচালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই সকল বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখা দ্বারা পূরণ করিবার মত যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সঙ্কট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু' বামনের চেষ্টার মত হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্ট স্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক

তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি এই ফলের যাহা কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে গিয়াছে এবং যাহা কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোন কার্য্যে ব্রতী হন না,—আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণা বাতাসের মত যখন কর্মের আবর্ত ঘিরিয়া ফেলে তখন ধূলায় বেশিদূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ ভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভাল দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোন মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম সূপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজনপাত্রে নিক্ষেপ করিলেন—এবং পার্শ্ববর্তিনী ঘৃণাসঙ্কুচিতা মহিলাকে কহিলেন—ভদ্রে, কোন নির্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত। গরম সূপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হউক, সম্পাদন কার্যের ত্রুটি উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাকে মার্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই, তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গতবর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহস্তার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি

রাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক

"এই নাটকে শালীনতাবোধ যেমন নির্লজ্জভাবে উপেক্ষিত তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না, নাটকটিতে বর্ণিত ঘটনাগুলি অসংলগ্ন এবং অশ্লীল। চরিত্রগুলির মুখে যে ধরনের সংলাপ বসানো হয়েছে তা নিন্দনীয়। তবে কি ভদ্র পাঠকের মনে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্যই এ অপপ্রয়াস?"

না, ভর্ৎসনা যথেষ্ট নয়। সমালোচক মহাশয় মনে করেন তেমন কিছুই অপ্রিয় কথা তিনি এখনো বলেননি। ন্যায্য কথা বলা দরকার, এবং তার খানিকটা শুনুন, "এই জঘন্য ট্রাশ নাটক যদি সত্যিই স্টেজে অভিনয় করানোর প্রচেষ্টা হয়, তবে আমরা মনে করি, সোনাগাছির বেশ্যা পল্লীই হবে সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ, সোনাগাছির অসৎ প্রকৃতির ভ্রষ্টারা ছাড়া এমন কুৎসিত নাটক তারিফ করনেওলা দর্শক খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়!"

আজকের দিনে কোনো বহুল প্রচারিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন সাময়িক পত্রে এ হেন বিধ্বংসী সমালোচনা প্রকাশ সম্ভব কি? বোধ হয় না, মানহানি মোকদ্দমার ফ্যাসাদ তো আছেই, তা ছাড়া অতো তিক্ত ভাষা ছাপাতে রাজি হবেন না সম্পাদক। এবং কোনো সমালোচক—তা তিনি যে নাটক পড়ে যতো ক্রুদ্ধই হোন না কেন, এমন সুপার ডিগ্রি অসংযত কলম চালাবেন না কিছুতেই।

কিন্তু বিগত শতাব্দীতে অতিশয় চোস্ত ইংরেজী ভাষায় উপরিউক্ত সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। একটুখানি বাংলা অনুবাদ আমরা করে দিলাম। লিখেছিলেন সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন এক অসামান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী। যাঁর বিরুদ্ধে লেখা—তিনি একজন বিখ্যাত ও শক্তিশালী সাহিত্যিক এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি নিজের নাম স্থায়ী অক্ষরে গেঁথে গেছেন। যে নাটক (কিংবা প্রহসন)-এর বিরুদ্ধে ঐ মারাত্মক মন্তব্য তা বাংলা সাহিত্যে, দোষেগুণে ভরা এক অমর সৃষ্টি যা

কিনা দীর্ঘ ১১১ বছর পরে আজও যথেষ্ট সজীব। এবং এই বিশেষ নাটকটি ও তার লেখক সম্বন্ধে স্বয়ং নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানিয়েছেন অনবদ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য—"বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। যে সময়ে '—' অভিনীত হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত। কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল, কিন্তু আপনার সমাজচিত্র '—'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই, সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া '—' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

প্রথমে রাগী সমালোচক মহাশয়ের খোঁজখবর নেয়া যাক। মাইকেল মধুসূদন যে বছরে জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই এক দরিদ্র পরিবারে ওঁর জন্ম। কি অদ্ভুত যোগাযোগ—মাইকেল ক্রীশ্চান হয়েছিলেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি, আর, ইনি ক্রীশ্চান হন সেই বছরই প্রায় পাঁচ মাস পর ২ জুলাই।

অবশ্য মাইকেলের সঙ্গে ঐ সময়ে তো মোটেই নয়—এমন কি পরবর্তীকালেও এঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ তেমন ঘটেনি।

তার কারণ দুজনে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রান্তসীমার ব্যক্তিত্ব, কোনো দিক দিয়েই মিশ খায় না।

মাইকেল উচ্চ বর্ণের এবং রীতিমতো বড়লোকের ছেলে। অত্যন্ত যত্ন ও আদরে বড়ো হয়েছেন। বাড়ির সমাদর ছাড়াও বন্ধুভাগ্য তাঁর বরাবরই খুব ভালো। বন্ধুরা ছিলেন তাঁর ভক্তের মতো। ইনি খুব গরিব ঘরের। একেবারে বাল্যকাল থেকেই এঁকে অতি তীব্র জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে এগোতে হয়েছে। তা ছাড়া জাতিভেদের কবলে পড়ে সামাজিক অত্যাচারও সহ্য করেছেন যথেষ্ট। বন্ধুর সহায়তা ও সান্নিধ্য পাননি বললেই হয়।

মাইকেল রূপবান, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, কালো রংয়ের ওপর তাঁর আশ্চর্য লাবণ্যময় চেহারা যে দেখেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে।

ইনি দেখতে নিতান্ত সাধারণ, তীক্ষ্ণ চোখ ও মুখশ্রীতে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা থাকলেও দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া চেহারা।

মাইকেলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ উড়নচণ্ডে। দু হাতে টাকা উড়িয়ে এবং বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনুষঙ্গিক হইহল্লা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ডুবে থাকা পছন্দ করেন খুব। তাছাড়া যে কোনো ব্যাপারেই লোকদেখানো আড়ম্বরের দিকে খুব ঝোঁক। এবং তাঁর ন্যায়নীতিজ্ঞান বেশ শিথিল।

আর ইনি খুব ধীরস্থির সাদামাটা জীবনের পক্ষপাতী। টাকাপয়সা কোনো দিনই বেশি আয় করেননি। বেশি আর্থিক স্বাচ্ছন্দের দিকে মাথাও তেমন ঘামাতেন না। বিলাসিতা একদম পছন্দ নয়—লোক-দেখানো আড়ম্বর, যাকে 'শো' করা বলে আর কি, তার থেকে শত হাত দূরে থাকেন। মুখে বিষণ্ণতার একটুখানি আভাস। কম কথা বলার অভ্যেস। অতি দৃঢ় নীতিজ্ঞানসম্পন্ন।

খ্রীষ্টধর্মে মাইকেলের দৃঢ় আস্থা ছিলো একথা সত্যি। কিন্তু এও সত্যি যে তিনি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কখনো করেননি। এমন কি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামাতে কিংবা আলোচনা করতে তাঁকে আদৌ দেখা যায়নি। [এই জন্যই সম্ভবত, কোনো কোনো খ্রীষ্টান পাদরী তাঁকে ভুল বোঝেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি আদৌ যথার্থ খ্রীষ্টান কিনা সে বিষয়ে সংশয় তোলেন।] আসলে মাইকেল মূলত ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক কবি-সাহিত্যিক।

অপরপক্ষে ইনি ছিলেন মূলত ধর্ম-প্রচারক ও শিক্ষাবিদ। ধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর চিন্তার সূচনা ছেলেবেলা থেকেই। প্রধানত এই দুটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়েই ধীরে ধীরে জীবন গড়েছেন। সাহিত্য-সেবাতে আকাঙ্ক্ষা ছিলো। শক্তিরও পরিচয় দিয়ে গেছেন। ইনিও প্রতিভাবান নিঃসন্দেহে। অবশ্য মাইকেলের অবিশ্বাস্য সাহিত্যপ্রতিভার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না।

মাইকেলের সঙ্গে তুলনা ছেড়ে আবার ওঁর জীবনে ফেরা যাক।

ছেলেবেলা থেকেই দুর্দান্ত মেধাবী। খুব ইচ্ছে ছিলো মহামতি হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে পড়বেন। অর্থাভাবে পড়তে পারেননি। অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা সেখানে শুধু পূর্ণ হয়েই যায়নি—উপচে উঠেছিলো। প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষাবিদ রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের সংস্পর্শে এলেন এবং ভর্তি হলেন তাঁর স্কুলে। পরে অবশ্য আরেকবার মহামতি হেয়ার সাহেবের কাছে এসেছিলেন ভর্তি হবার আর্জি নিয়ে। সেবার সিটও ছিলো। কিন্তু হেয়ার তাঁকে নেননি। সকলেই জানেন, মহামতি হেয়ার সাহেব ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ধর্মটর্ম নিয়ে যেসব ছাত্র মাথা ঘামাতো বা ধর্মীয় বক্তৃতা শুনতে যেতো—তাদের—দরকার হলে চাবুক মেরে সিধে করতেন তিনি। এঁকে তাই খোলাখুলি বলেছিলেন, তুমি আলেকজাণ্ডার ডাফের ছাত্র, বাইবেল পড়েছ, তার মানে তুমি আধা খ্রীষ্টান। তোমাকে নিতে পারি না। তোমাকে নিলে তুমি আমার ছাত্রদের একেবারে নষ্ট করে দেবে।

উনিশ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার ডাফের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। এর পর ধর্মপ্রচারক রূপেই তাঁর আবির্ভাব। শিক্ষাজগতে খুব সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে বিরাট সুনাম পান। বক্তা হিসেবে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। দুটি প্রখ্যাত ইংরেজী সাময়িকপত্র এবং একটি বাংলা পাক্ষিক রীতিমতো যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন।

শ্যামবর্ণ সাধারণ চেহারার এই তেজী বাঙালীর বিবাহ-প্রসঙ্গটিও দারুণ রোমাঞ্চকর। প্রথমে ঠিক করেছিলেন বিয়েই করবেন না। তারপর চৌত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎই একটি জার্নালে গুজরাটনিবাসী এক বিদুষী গুণবতী প্রার্থী খ্রীষ্টান রমণীর বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। মহিলা এবং তাঁর বাবার সঙ্গে কয়েকটি চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়। মুগ্ধ ইনি ঠিক করলেন, মহিলার সম্মতি যদি পান তবে ওঁকেই বিয়ে করবেন। সব চেয়ে আগে গুজরাট পৌঁছে সেই মহিলা ও তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো অতো টাকা তিনি পাবেন কোথায়। হুট করে গুজরাট গেলেই তো হবে না।

যাতায়াত ভাড়া—সেখানে বেশ কিছুদিন থাকা।—লম্বা খরচের ধাক্কা। হিসেব ক'রে দেখলেন প্রায় ১৩০০ টাকার মতো। অনেক চেষ্টাতেও যোগাড় হলো না। ভাবছেন কি করা যায়! এদিকে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আবার গুজবও শুনলেন যে খুব বেশি দেরি করলে সেই গুণবতী কন্যা অন্য কোনো পাত্রকে বরমাল্য দিয়েও দিতে পারেন। বিপদ কখনো একা আসে না। আবার সিপাহী বিদ্রোহের হাঙ্গামাও শুরু হয়ে গেলো পুরোদমে। সুদূর গুজরাটের যাত্রাপথ অতিশয় বিপদজনক। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে দু বছর পর অবশেষে ইনি পৌঁছোলেন গুজরাটে। তরুণীর দেখা পেলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই জয় করলেন তাঁর হৃদয়। বিয়ে হলো ১৮৬০ খৃঃ ২রা জানুয়ারি। গুজরাটে বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমাদের ইনি অতিথিদের উদ্দেশ করে নির্ভেজাল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। শ্বশুর মশাই হরমদজি পেসটনজির কাছে বাংলা বক্তৃতার গুজরাটী অনুবাদের কপি দিয়েছিলেন। উনি সেটি পড়বার পর আবার গুজরাটী ভাষণের ইংরেজী অনুবাদও তিনি পড়ে শোনান। দারুণ ব্যাপার বলতে হবে!! নববধূকে নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। তাঁদের দীর্ঘ বিবাহিতজীবন অতি সুখের হয়েছিলো। পার্শী তরুণী মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে নিজেকে খুব মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

এই তেজী বাঙালীর ইংরেজী ভাষায় অধিকার কিংবদন্তীর মতো। যেমন লেখায়, তেমনি বলায়, কোথাও কোনো ভুল নেই, নিখুঁত ভাষাজ্ঞান যাকে বলে! সাহেবরা পর্যন্ত একবাক্যে স্বীকৃতি দেন। ইংরেজি বলায় ও লেখায় নিজের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন। মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অহঙ্কার জমিয়ে রেখেছেন। যদিও, অন্যের কাছে সে অহঙ্কার স্থূলভাবে প্রকাশ করে কুরুচির পরিচয় দেন না কখনো। তবে অনুরাগী বা গুণমুগ্ধরা এসে যখন তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান নিয়ে শতমুখে তারিফ করে, তখন সেই প্রশংসা তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গে নেহাৎ সহজ ভাবেই তা গ্রহণ করেন। ভাবটা—হ্যাঁ, তা তো জানা কথা-ই।

কায়দা করে অনুরাগীদের কখনো কখনো জানিয়েও দেন, অমুক অমুক জ্ঞানীগুণী চাঁই সাহেব বা ভারতীয়রা তাঁর সম্বন্ধে কোথায় কবে আরো কি কি তারিফ করেছেন। অবশ্য তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় লেখার ভাষা চটকদার, ঝলমলে ও লঘুগতি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুগম্ভীর ও শান্ত জনসনিয়ান ইংরেজী। খুব জোরদার। কিন্তু গতি বেশ মৃদু। কৌতুক রসকেও পারতপক্ষে এড়িয়েই গেছেন। ফলে, প্রথমটায় পড়তে একটু নীরস মনে হয়। তবে, খানিকটা পড়ার পর ভালো লাগে।

কিন্তু ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কমূলক লেখায় তাঁর ভাব। অন্য রকম। তা নিষ্ঠুর, বুদ্ধিদীপ্ত, বিদ্রূপ ও কৌতুকে ভাস্বর। চটকদার মন্তব্যে ছড়াছড়ি।

শুধু মাত্র কায়দা ও ফ্যাসানের পিছনে দৌড়রত আজকের দিনের হঠাৎবনা নকল (ভারতীয়) সাহেব যে তিনি ছিলেন না তা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। মেকি-অন্তঃসারশূন্য সাহেবিয়ানার বাঁদুরেপনা তাঁকে ছুঁতেও পারেনি, উচ্চস্তরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর হৃদয়টি পূর্ণ ছিলো দেশ প্রেমে এবং সে হৃদয় একান্তভাবে নির্ভেজাল বাঙালী হৃদয়। কি পারিবারিক কি সামাজিক জীবনে তিনি আগাগোড়াই মধ্যবিত্ত-ভদ্র-শিক্ষিত বাঙালী। তাই বাঙালীর নিজস্ব উৎসব আমোদ-প্রমোদ খেলাধূলা সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতের মন্তব্যর জবাবে —বারো মাসে তেরো পার্বণ তথা খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের ওপর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে অপূর্ব সব প্রবন্ধ লিখতেও তাঁকে দেখা যায়। আবার রো এবং ওয়েব সাহেব তাঁদের “হিন্টস অফ দি স্টাডি অফ ইংলিশ” গ্রন্থের ভূমিকায় বাঙালীদের অশুদ্ধ ইংরেজি জ্ঞান ও “বাবু ইংরেজি” লেখার প্রবণতা নিয়ে যখন বিদ্রূপ করেন, তখন অবিলম্বেই রুদ্রমূর্তিতে ইনি দেখা দেন রণক্ষেত্রে। সাহেবদ্বয়ের ঐ বইয়ের প্রথম পাতা থেকে শুরু করে একটির পর একটি অজস্র ভুল বার করে ছাপিয়ে দিয়ে তাঁর তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য—‘যাঁরা নিজেরাই ইংরেজি লিখতে জানেন না, তাঁদের পক্ষে অন্যের ভুল ধরতে যাওয়া সাজে না। বঙ্গে এখন বেশ কয়েকজন বাঙালী রয়েছেন, যাঁদের পায়ের কাছে বিনীতভাবে বসে বহু

সাহেব ইংরেজি ভাষা শিখে যেতে পারেন।'

রো এবং ওয়েব আর টুঁ শব্দ করেননি।

ওঁর দুটি বিখ্যাত বই। "গোবিন্দ সামন্ত" ও "ফোক টেলস অফ বেঙ্গল।" বলা বাহুল্য যে, দুটিই ইংরেজি ভাষায় লেখা।

কোনো কোনো গবেষক ওঁকে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" নামক একটি বাংলা উপন্যাসের লেখক বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি ও প্রমাণ-পরম্পরা দেখে ঐ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে হয়। পল্লীবাংলার গৃহস্থ জীবনের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটি ওঁর সম্পাদিত পাক্ষিক "অরুণোদয়ে" (সূচনা ১৮৫৭ খ্রীঃ) প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে এবং পরে লেখকের নাম ছাড়াই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সময়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্যারীচাঁদ মিত্রের অমর সৃষ্টি "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশের পরের বছর—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

"গোবিন্দ সামন্ত" পড়বার পর ভালো না মন্দ বিচারের আগে প্রথমেই যে কথাটি আমাদের মনে হয়েছিলো সেটি এই—গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে না দিতে পারলে এ ধরনের বই সে-যুগে লেখা সম্ভব হতে পারে না, পরিষ্কার বোঝা যায়, লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বর্ধমান জেলার এক দরিদ্র চাষী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অনাবৃষ্টির দুর্ভিক্ষে নায়ক গোবিন্দের মৃত্যুর বর্ণনার সঙ্গেই উপন্যাসটি শেষ করেছেন লেখক। গ্রামকেন্দ্রিক দরিদ্র বাঙালী কৃষকজীবন এবং তৎকালীন সমাজ, নানান ধরনের ও পেশা-র মানুষের কাজকর্ম, চলনবলনের খুঁটি-নাটি বিবরণ তিনি যে সমবেদনা ও সততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তা দেশী-বিদেশী বহু পাঠককেই মুগ্ধ করে দেয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন পর্যন্ত একখানি অযাচিত পত্র লিখে প্রচুর সাধুবাদ জানান।

বাংলার নিজস্ব উপকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন তিনিই প্রথম। ঘরোয়া চিরকালীন উপকথাগুলি শুনে আসতেন সরল ঘরোয়া বিভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষের কাছ থেকে, এমন কি জনৈক নাপিতের কাছ থেকে পর্যন্ত।

তারপর সিধে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতেন। নাম দিলেন—"ফোক টেলস অফ বেঙ্গল"। ইংরেজীতে রচিত হলেও উপকথাগুলি পড়তে গিয়েই সন্দেহ থাকে না যে এ বাঙালী জীবনের ওপর রচিত। কোনো ফাঁকি নেই। এই অসামান্য কাজ শতমুখে প্রশংসার যোগ্য। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি এ ব্যাপারে তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর ইংরেজী মাসিক বেঙ্গল ম্যাগাজিনে এটি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি চমৎকার ভাবে বললেন—'তাঁর এই উপকথা সংগ্রহের প্রচেষ্টা যতোই অকিঞ্চিৎকর হক, লোককথা ও অতীত কাহিনী অবলম্বন করে আধুনিক কালে যে সাহিত্য গড়ে উঠছে তাতে কিছুটা সাহায্য হবে। এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত উপকথার সঙ্গে বাংলার উপকথা তুলনা করলে প্রমাণ হবে গঙ্গাতীরের কালো কালো প্রায় উলঙ্গ কৃষাণ হলো গিয়ে টেমস নদীর তীরে ধবধবে ফরসা ও ঝকঝকে পোষাক পরা ইংরেজের দূর-সম্পর্কের ভাই।'

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ অবশ্য খুব উল্লেখযোগ্য নয়, এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। আগেই বলেছি, ইনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী, ধর্মপ্রচারক, অধ্যাপক ও সাহিত্যরসিক। প্রবন্ধ বা ঐ ধরনের গদ্যরচনা দারুণ লিখতেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক গল্পকার বা নাট্যকার তো নন। সে মানসিকতা তাঁর ছিলো না। কোনো বুদ্ধিজীবী গল্প বা উপন্যাস লিখতে গিয়ে যে রকম অসুবিধের মুখোমুখি হবেন আর কি! সব চেয়ে প্রধান দোষ, সংলাপে প্রাণ নেই—খুব দুর্বল এবং দু' চারটি কথা বলতে না বলতে কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে। চরিত্র তিনি অনেক এবং বিভিন্ন রকমের এনেছেন—কিন্তু চরিত্রগুলি যদি জীবন্ত কথাবার্তাই না বলে তাহলে কি আর কাহিনা জমানো যায়? তাছাড়া কাহিনীর ক্ষেত্র প্রসারিতও করতে পারছেন না—কল্পনাশক্তির অভাবে খানিকটা এগিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে থেমে যাচ্ছেন, যেখানে অনেক কিছু বর্ণনা বা বলা দরকার সেখানে অতি সংক্ষেপে দু'চারটি লাইনে কাজ সেরে নেওয়ায় জায়গায় জায়গায় প্রবন্ধের মতো হয়ে গেছে, খণ্ডচিত্র হিসেবে অবশ্য বেশ কয়েকটি অংশ খুব উজ্জ্বল—পাঠকের একেবারে চোখের

সামনে ঝকঝক করে ওঠে—কিন্তু বাঁধুনী খুব ঢিলে। একটি ঘটনা বা দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তী কাহিনী মোটেই সংবদ্ধ নয়। রঙ্গ-রসিকতা কৌতুক বর্জনের ফলে পড়তে খানিকটা নীরসও লাগে।

কিন্তু সাহিত্যিক উৎকর্ষের কমতি কিংবা অভাবকে ভুলে যাওয়া যায়, গ্রন্থগুলির চমৎকার ডকুমেণ্টারি ভ্যালুর কথা স্মরণ করে। তিনি কলমের আঁচড়ে হারিয়ে যাওয়া যুগের সত্যনিষ্ঠ যে দলিল লিখেছেন তা চিরদিনই একটি বিশেষ মর্যাদা পাবে।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা ও মতামত সামান্য আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আমাদের মনে হয়—বাংলা সাহিত্য-ভাবনায় তাঁর মানসিকতা বেশ সীমাবদ্ধ ছিলো, সাহিত্যবিচারে তিনি কৃতিত্বের বা যোগ্যতার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে তিনি চোদ্দ বছরের বড়ো —যদিও দুজনের মৃত্যু হয় একই বছরে, ১৮৯৪ খ্রীঃ। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় ও বিজয় তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে, বঙ্কিম-সাহিত্য প্রীতির চোখে দেখেন নি তিনি। তাঁর গর্ব ছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে তিনি অনেক ভালো ইংরেজী লেখেন। তাঁর দাবী ন্যায্য। কিন্তু সেটাই কি শ্রেষ্ঠতার একমাত্র মাপকাঠি ?

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে রেষারেষির পাল্লা দিয়ে ইংরেজী মাসিকপত্র 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' বার করলেন। দুজনেই তখন বহরমপুরে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের তারিখ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' চার মাস পরে অগস্টে। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' খুব ভালো মাসিকপত্র ছিলো। নামকরা লেখকেরাও লিখতেন। 'বঙ্গদর্শনে'র চেয়ে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এর ইজ্জত এবং নামডাক কম ছিলো না সেদিন। হয়তো কিছু বেশি ছিলো বলা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর কোথায় ? বঙ্গভূমিতে বাংলা ভাষাই হবে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তার বাহন—একথা বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অলৌকিক প্রতিভা নিযুক্ত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের সেবায়। 'বঙ্গ-দর্শন' শিক্ষিত বাঙালীর মনে উজ্জ্বল প্রভায় বেঁচে রয়েছে এবং থাকবে।

কিন্তু 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে'র নাম ও পরিচয় কোথায় হারিয়ে গেছে!

যদিও ইনি স্পষ্ট বলেছিলেন—"বঙ্গভাষাকে বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মাতৃভাষাতে বঞ্চিত সে বঙ্গদেশের তাবৎ সুখেই বঞ্চিত।" কিন্তু তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে কালে ইংরেজী ভাষাই হবে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তার একমাত্র বাহন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় বই ইনি খুঁটিয়ে পড়তেন এবং প্রয়োজন বোধে সমালোচনা করতেন। কিন্তু ভাষাটা ছিলো ইংরেজী। উচ্চ চিন্তার বাহন ইংরেজীর মতো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষারই হওয়া উচিত—এ ছিলো তাঁর দৃঢ় অভিমত। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি ঈর্ষা করতেন মনে হয়। যদিও এ ঈর্ষার কি কারণ থাকতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্র মূলত বাংলাভাষার লেখক। এবং তিনি লেখক মূলত ইংরেজী ভাষার। বঙ্কিম-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তিনি অঙ্কে ধরতে পারেন নি। প্রথম শ্রেণীর বা উঁচুদরের সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বীকৃতি দিতে তিনি কোনোমতে রাজি নন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কার্যকারণ এবং কাহিনীবিন্যাস তাঁর কাছে হাস্যকর ঠেকে। বঙ্কিমের ভাষা তাঁর পছন্দসই নয়। বঙ্কিমের অপূর্ব প্রবন্ধগুলি তাঁর মনে দাগ কাটে না। বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁর কাছে বাস্তবতা-বর্জিত কবিতা বলে মনে হয় এবং তুলনায় জয়মাল্য দেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'কে। বঙ্কিম-সাহিত্যের যদি কিছুবা প্রশংসা করেন—অমনি টেনে আনেন ঔপন্যাসিক স্কটকে। অর্থাৎ স্কটের একজন বড়ো ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বা 'স্কটের প্রভাব বঙ্কিমের লেখায় বড্ডো বেশি বা চরিত্রগুলি স্কটের আদর্শে গেঁথেছেন' বা 'এখানে স্কটের পদ্ধতি বেশ যোগ্যতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিম।'

প্রশ্ন এই—'দুর্গেশনন্দিনী' ছাড়া বঙ্কিম-সাহিত্যেও স্কটের প্রভাব কি সত্যিই খুব বেশি! আমরা তা মনে করি না। বরং আমরা বলি, স্কট একজন মহান্ সাহিত্যিক সন্দেহ নেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের চেয়ে নিশ্চয়ই বড়ো এবং ইংরেজী সাহিত্যে স্কটের যে স্থান, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান তার চেয়ে ঢের ঢের ওপরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গাঁথুনি ও চরিত্র সৃষ্টিতে অনেক অসঙ্গতি

দেখতে পেয়েছেন ইনি। সেই সেই দোষ উল্লেখ করে নিজস্ব মতামত দিয়ে গেছেন। যেমন সূর্যমুখীর হঠাৎ ফিরে আসা অবাস্তব, নগেন্দ্রনাথ চরিত্র পরস্পরবিরোধী, আত্মহত্যা কুন্দনন্দিনীর নয়—নগেন্দ্রনাথেরই করা উচিত ছিলো, ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে আমরা কিছু মন্তব্য করতে চাই না। কারণ, কি ভালো লাগলো আর কি ভালো লাগলো না—কি হলে আরো ভালো হতো—সাহিত্য-সমালোচকের সেকথা বলার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

তবে বিশেষ প্রশংসার কথা এই—বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও তিক্ত মনোভাবের পরিচয় দেননি। গা-জ্বালানি মন্তব্যও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রও ওঁর ওপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না সেকথা বলে রাখা ভালো। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ওঁর সঙ্গে কলম-লড়াইতে নামেন নি কোনো দিন।

এবার নাট্যকার মহাশয়ের খোঁজ নিই। ইনি মাত্র চৌত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন। এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্য-জগতে নিজের নাম চিরস্থায়ী করে গেছেন। ডাক ও তার বিভাগের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাতায়াত করতে হয়। এরই ফাঁকে অতি সজাগ দৃষ্টি, আন্তরিকতা ভরা হৃদয় এবং সংবেদনশীল মন দিয়ে দেখেছিলেন আশেপাশের অসংখ্য নারী-পুরুষকে। এরা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের। তাতে কিছু যায়-আসেনি নাট্যকারের। অদ্ভুত দক্ষতায় তাদের মুখের ভাষাকে তিনি সরাসরি রূপ দিলেন সাহিত্যে।

নাট্যকার মহাশয় বয়সে সমালোচক মহাশয়ের চেয়ে ছয় বছরের ছোট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে আট বৎসরের বড়ো। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিম তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখেন। আর নাট্যকার মহাশয় তাঁর প্রথম নাটক লেখেন ১৮৬০ খ্রীঃ ত্রিশ বছর বয়সে। প্রথম নাটকেই কিস্তিমাত। একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড, মুখে মুখে কথা ছড়াচ্ছে—হাতে

হাতে নাটকটি ঘুরছে। পক্ষে বিপক্ষে প্রশংসা-নিন্দার ঝড়। বঙ্গদেশের সীমা টপকে ইংরেজী ও আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৌঁছে যায় বিভিন্ন প্রান্তে। নাট্যকারের সব চেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় নাটক এটিই। তাঁর জীবৎকালেই বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয় ও পরবর্তী সময়ে আরো অনেক সংস্করণ বার হয়েছে।

সাতটি নাটক তিনি লেখেন এবং একটি বাদ দিয়ে বাকি সব ক'টি কম বেশি জনপ্রিয়। 'মাস পপুলারিটি' বলতে যা বোঝায় তিনি তা যথেষ্ট পেয়েছিলেন, আর বিজ্ঞ শিক্ষিত ভালো পাঠকরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। নাট্যকারের স্থূল রুচির নিন্দা করেছেন ঠিক—কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা প্রশংসা করারও অনেক কিছু পেয়েছেন খুঁজে। মানতেই হবে নাট্যকার তাঁর নাটকের বহু জায়গায় যে আশ্চর্য জীবন্ত, একেবারে চলতি বাংলায় লেখা সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা অজস্র সাধুবাদের দাবী রাখে। নাটকগুলির দোষত্রুটিকে অনেকটা ঢেকে ফেলেছে দুর্দান্ত সংলাপের ভাষা। সত্যি কথা বলতে কি —বেশ কিছু চোস্ত সংলাপ এমন সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, বক্তার হাল-চাল চরিত্র-চেহারা পাঠকের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত নারীপুরুষের মুখের ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, কলকাতার ইয়ারবন্ধুর রসালাপ—সবই একেবারে অবিকল উপস্থাপিত। শুধু সংলাপই নয়—নাটকে বিশেষ বিশেষ ধরনের চরিত্রসৃষ্টিও করেছেন অত্যন্ত দক্ষতায়।

এ কথা কিন্তু আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে নাট্যকার মহাশয় শক্তিমান হলেও তাঁর ক্ষমতা ছিলো সীমাবদ্ধ। ভদ্র-শিক্ষিত-সুস্থ স্বাভাবিক স্নেহময় মার্জিতরুচি নরনারী, মানবজীবনের মধুর ভাব, কোমল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আঁকতে গিয়ে তাঁর কলম যেন চলতেই চায় না। চরিত্রগুলি প্রাণহীন কৃত্রিম হয়ে ওঠে। শক্ত শক্ত কথা বলে। লম্বা লম্বা সংলাপ যেন আর শেষ হতেই চায় না। দুঃখ বা আনন্দের দৃশ্যে এমন বড়ো বড়ো ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে যে বলবার নয়। চরিত্রগুলির গভীরে ঢোকার অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রবণতাও নেই নাট্যকারের। প্রেমের

দৃশ্য বর্ণনায় তো একেবারে ভরাডুবি। নায়ক-নায়িকা স্বাভাবিক কথা খুঁজেই পায় না। দীর্ঘ কবিতা বলতে থাকে একটানা, যদি বা গদ্য বলে তা গদগদ কৃত্রিম ভাষার উচ্ছ্বাস।

কিন্তু যেই বিকৃত উদ্ভট, শয়তান, মাতাল, পাপী, অপরাধী, নির্লজ্জ বেশ্যা, দালাল আঁকার দরকার হলো—তিনি, যাকে বলে, মাস্টার আর্টিস্ট! তুবড়ির মতো বার হয়ে আসছে দুর্দান্ত সংলাপ। কৌতুক ও বিদ্রূপ উপচে পড়ছে। চরিত্রগুলি উঠে দাঁড়াচ্ছে জীবন্ত হয়ে। চলছে ফিরছে। একান্ত স্বাভাবিক তাদের হাসিকান্না, আশাআকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে যায় পাঠককে। বঙ্কিমচন্দ্র ওঁর সম্বন্ধে সাফ বলে দিয়েছেন—"কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিকৌশল। তাঁহার এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তবে যাহা সূক্ষ্ম কোমল মধুর করুণ প্রশান্ত—সে-সকলে তাঁহার তেমন অধিকার ছিল না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত—তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

এই প্রবন্ধের শুরুতে যে বিধ্বংসী সমালোচনাটি উল্লেখ করেছি—সেটি যে নাটক সম্বন্ধে, এবার তার কথাই একটু বলা যাক। আমাদের মতে, দোষ অনেক থাকলেও নাটকটি এক অসামান্য সৃষ্টি। বড়োলোকের বখে যাওয়া মায়ের আদুরে ছেলে অটল, বেশ্যা কাঞ্চন, তোষা-মুদে ভোলানাথ, অটলের স্ত্রী কুমুদিনী, ঘটিরাম ডেপুটি এবং মাতাল নিমচাঁদ আসর জমজমাট করে তুলেছে। মদ্যপান, বেশ্যাগমন, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি নিয়েই লেখা এ নাটক, উজ্জ্বল সংলাপের ছড়াছড়ি। এবং তা-ও ছাপিয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য চরিত্র—নিমে দত্ত! সে বিপথগামী শিক্ষিত বাঙালী মাতাল। পতনের শেষ সীমায় পৌঁছেছে—জানে ফেরার আর রাস্তা নেই। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়-বোধ তবু একটু রয়ে গেছে—টিঁকে আছে একটুখানি বিবেক। সব কিছু জানে বোঝে, সামাজিক অন্যায়কে আঙুল তুলে দেখায়। আবার নিজেকেও বিদ্রূপ করে। বাইরে হাসি অথচ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ মাতাল, কলঙ্কিত চরিত্রটি নাট্যকারের কলমের জোরে ঝলমল করে উঠেছে, তার কাজকর্ম কথাবার্তায় পাঠক হাসেন,

সেই সঙ্গে হতভাগ্যের জন্য একটু দীর্ঘনিশ্বাসও বোধ হয় পড়ে। যদি নিমে দত্তর চরিত্রটি জমিয়ে ঠিকমতো অভিনয় করানো যায়, তবে এ নাটক আজও প্রচণ্ড সাফল্য এনে দেবে।

নাট্যকার তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই আমদানি করতেন বাস্তব জগৎ থেকে। এই তাঁর এক বদ দোষ (গুণ) ছিলো। এমন কি সমকালীন অনেক জীবিত চরিত্র পর্যন্ত ওঁর নাটকে ঢুকেছে, এ কথা কবুল করেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। অনেকেই বলেন, নিমে দত্ত চরিত্রটিতে ছায়া পড়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তর। কৌতূহলী কেউ কেউ খোদ নাট্যকারকে একদিন জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আরে রামোচন্দ্র! তাই কি পারি? "মধু কখনো নিম হয়?"

'মধু' ও 'নিম' কথা দুটির সুকৌশল প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো!

নাট্যকারের এই উক্তিটি এবং নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত একটি সংলাপ উল্লেখ করে অনেকে বলেন, নিমে দত্তকে মাইকেল মধুসূদনের ছাঁচে তৈরি করেছেন নাট্যকার এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে গুজব। কি সেই সংলাপ?

"অটল। আমি মেঘনাদ বধ কিনিচি।

নিমচাঁদ। আমি পড়বো।

অটল। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিমচাঁদ। ওব ভাল মন্দ তুমি বুঝবে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েচে দাশরথি, তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মানিক। মাইকেল দাদা বাঙ্গলার মিলটন।"

অপরিমিত মদ্যপান করার অভ্যাসটা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে মাইকেলের সঙ্গে নিমচাঁদের অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে মিল নেই। কিন্তু মাইকেলকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর হাবভাবের সঙ্গে পরিচিত তৎকালীন বহু ব্যক্তি একবাক্যে বলেন, নিমে দত্তর কথাবার্তার ভঙ্গীতে মাইকেলের খানিকটা ছায়া আসে বটে। বিশেষত মাইকেলের মুদ্রাদোষ, কোনো কোনো বিশেষ ঢং-এর মন্তব্য, হাত নাড়া নাকি নাট্যকার হুবহু বর্ণনা করেছেন। মদ্যপান করে নিমে দত্ত যখন রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, সেই সময়ে লণ্ঠন হাতে উপস্থিত হলো পুলিশ। আলো দেখে মাতাল

নিমচাঁদ চেঁচিয়ে মিলটন আবৃত্তি করতে থাকে—"হেইল হোলি লাইট !" ইত্যাদি। এ নাকি মাইকেলের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা। নিমে দত্তর আরেকটি সংলাপ—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়। ছাটস মরাল কারেজ। (বুকে হাত দিয়ে) আমি সেই মরাল কারেজের ছেলে বাবা।" মাইকেল নাকি এরকম ভাবেই কথা বলতেন !

যাই হোক, সমালোচক মহাশয় এবং নাট্যকার মহাশয় সম্বন্ধে আমরা তো সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলাম। এবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসি—ঐ বিশেষ নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক মহাশয় ক্রোধে অমন ক্ষিপ্ত হয়ে যা মুখে আসে তাই বলে দিলেন কেন ?

আসলে বুদ্ধিজীবী সেই সমালোচক কঠোর নীতিবাগীশ ব্যক্তি ছিলেন। সৎ সাহিত্য, শুদ্ধ রুচি সম্বন্ধে তাঁর যে নিজস্ব আদর্শ থাকবে তা তো স্বাভাবিক। সৌন্দর্যবোধকে যে সাহিত্য পীড়ন করে, নিয়ে আসে পঙ্কিলতা—তা কোনোমতেই সৎ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, এই ছিলো তাঁর দৃঢ় মত। এই নাটকে বর্ণিত অতিরিক্ত মদ্যপান, মাতলামির ঢালাও বর্ণনা, হিজড়ের সাহায্যে সুন্দরী—সম্পর্কে মামী-শাশুড়ীকে তুলে নিয়ে আসার জন্য অটলের চেষ্টা, দুষ্ট বেশ্যার বিবরণ, বাড়ীর বৈঠকখানায় বেশ্যা নিয়ে আসা, ভদ্রঘরের ছেলেদের আলগা উলটোপালটা সংলাপ, বেশ কিছু স্থূল রঙ্গরসিকতা—এ একেবারে তাঁর সহ্যের বাইরে চলে যায়। এমন নাটক ভদ্রসমাজে অভিনীত হবে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি আঁতকে ওঠেন। এবং সেই জন্য কলম ধরে-ছিলেন নাটকটি সমূলে উচ্ছেদ করতে। নাটকের মহৎ ও প্রশংসার্হ দিকটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। বিজ্ঞ সমালোচক তাঁর তীব্র সমালোচনায় "সোনাগাছি"-র কথাটা উল্লেখ করে দিলেন কেন ? কারণ বোধ হয় এই, নাট্যকার নিজেই তাঁর এই নাটকে সোনাগাছির প্রসঙ্গ তুলেছেন বেশ কয়েকবার। একটি/দুটি সংলাপ উদ্ধৃত করছি। বড়ো-লোকের বখে-যাওয়া-ছেলে অটলের স্ত্রী কুমুদিনী এবং বোন সৌদামিনী কাঁশারিপাড়ার বাড়ীতে কুমুদিনীর শোবার ঘরে নিভৃতে কথাবার্তা বলছে।

“সৌদামিনী। দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন এমন সোমত্তে মাগ রেখে সেই সুঁটকে মাগীকে নিয়ে থাকে! দেখিচিস তার হাত-পা গুণো যেন বাকারি।

কুমুদিনী।...সে হলো বাজারে বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি সাঁকারি তা আমি কেমন করে দেখ্‌বো আর তুই বা কেমন করে দেখলি —সোনাগাছি গেচ্‌লি নাকি?”

স্থূল রুচির দিকে নাট্যকারের প্রশ্রয়টা যে বেশি ছিলো সেকথা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্রও নাট্যকারের রুচির দোষকে পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি বলছেন, “ইহাতে যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষ-ও আছে, এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এইজন্য আমি ‘—’কে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছুদিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।”

নাট্যকারের রুচির দোষের কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, সহানুভূতি নাট্যকারের অধীন নয়, নাট্যকার নিজেই সহানুভূতির অধীন। পতিত, পাপী চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর মমতা—ফলে চরিত্রগুলি আঁকতে বসলে পুরো ব্যাপারটাই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কলমের আগায় এসে পড়তো। কিছু বাদসাদ দিয়ে মার্জিত করার শক্তি তাঁর ছিলো না।

“নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না...সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, ‘আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা, দেখিতেছ না যে,...নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।’...রুচির মুখরক্ষা করিতে গেলে ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।”

নাট্যকার মহাশয় কবিতাও লিখতেন অল্পস্বল্প। কবিতার বইও

প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, কবিতা লেখার শক্তি তাঁর মোটেই ছিলো না। তিনি নিজেও বোধ করি কথাটা জানতেন। গবেষকরা বলেন, অক্ষম সন্তানের প্রতি বাপমায়ের যেমন একটুখানি বেশি দুর্বলতা—টান থাকে, তেমনি ওঁরও ঐ কবিতাগুলির ওপর টানটা বেশিমাত্রায় ছিলো!

এদিকে আরেক মুশকিল, বিদগ্ধ সমালোচক মহাশয়, পূর্বোক্ত তিক্ত সমালোচনার বেশ কিছুকাল পর, নাট্যকার মহাশয়ের "সুরধুনী" কাব্য-গ্রন্থেরও প্রতিকূল সমালোচনা করলেন। অবশ্য নাটকটিকে যেভাবে নিন্দা করেছিলেন, সেভাবে নয় আদৌ—শান্তভাবেই রস বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে ওগুলো কবিতা হয়নি।

নাট্যকারের ওপর প্রতিকূল সমালোচনাগুলির প্রভাব কি রকম দাঁড়ায়?

নাট্যকার মহাশয় ইতিপূর্বে জীবনে কখনো কারো ওপর রাগ করেননি। তাঁর শরীর ও মন যে সম্পূর্ণ ক্রোধমুক্ত ছিলো এ কথা বিগত যুগের বহু ব্যক্তি হলপ করে বলে গেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'মনুষ্য মাত্রেরই অহঙ্কার আছে, '—'র ছিল না। 'মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে, '—'র ছিল না। তাঁহার কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া, শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, 'কই রাগ যে হয় না'।"

বস্তুত ইনি ছিলেন সদানন্দময় দারুণ মজলিসী লোক। তাঁর রঙ্গ-রসিকতায় হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরা শ্রোতা 'আর হাসতে পারি না' বলে পালিয়ে যাচ্ছেন এমন দৃশ্য হামেশাই দেখা যেত।

এমন কি তিনি নিজের মৃত্যুপ্রসঙ্গেও পরিহাস করতে ভোলেননি। আগেই বলেছি মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু, মূল ব্যাধিটি ছিলো, ডায়াবেটিস। শরীরে তিনটি ফোড়া হয়েছিলো—তার থেকে ঘা হয়ে যায়, সে ঘা আর শুকোয়নি—সেই দুরারোগ্য ঘা-ই হলো তাঁর মৃত্যুর কারণ। প্রথম ফোড়া দেখা দেয় পিঠের মাঝখানে, দ্বিতীয় ফোড়াটি

কোমরে। তৃতীয় এবং সব চেয়ে মারাত্মক এই শেষ ফোড়াটি হয় বাঁ পায়ে, এর কয়েকদিন পরেই তিনি মারা যান। তৃতীয় ফোঁড়া হওয়ার পর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো?" নাট্যকার "অতি দূরবর্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে'।"

তা, এই ইনি, জীবনে ইতিপূর্বে একবারও রাগ-না-করা নাট্যকার—আজকের পাঠক মাথা গুলিয়ে যাওয়া কথাটা একবার ভেবে দেখুন—জীবনে প্রথমবার রেগে গেলেন ঐ বিদগ্ধ সমালোচকের প্রতি।

নাট্যকার তাঁর পরবর্তী নাটক 'জামাই বারিক'-এ 'ভোঁতারাম ভাট' নামে চরিত্র আমদানি করলেন—যে ভোঁতারাম নির্বোধের মতো সাহিত্য-বিচারক। বলা বাহুল্য, বিদগ্ধ সমালোচক এসেছেন ভোঁতারাম ভাট নামে। বিদগ্ধ সমালোচকের নাম উল্লেখ না করলেও নাট্যকার এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যাতে কারুর বুঝতে বাকি থাকেনি ছদ্মনামের আড়ালে প্রকৃত ব্যক্তি কে!

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন, ঐ চরিত্রটি সৃষ্টি ক্রোধের বশে। এবং নাট্যকার মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক ক্রোধশূন্য চরিত্রে এটি এক "ক্ষুদ্র কলঙ্ক"।

'জামাই বারিক'-এর সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি:

পঞ্চম জামাই। পাঁচি তোর ছন্দপতন হয়েছে।

প্রথম জামাই। কূয়োর ভিতর।

পঞ্চম জামাই। ঠাট্টা কর না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জামাই। তাঁর নাম কি?

পঞ্চম জামাই। ভোঁতারাম ভাট।

প্রথম জামাই। যিনি বৈষ্টব ছিলেন তারপর কলমা কেটে কাজি হয়েছেন?

পঞ্চম জামাই। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান করো না—তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার—ভোঁতারাম বলেন, কবিতা লেখার প্রণালী হচ্ছে 'তিন তিন দুই তিন', তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েছে।"

পরিচয়গুলো এবার দিয়ে দিই। 'গোবিন্দ সামন্ত' ও 'ফোক টেলস অফ বেঙ্গল'-এর লেখক বিদগ্ধ সমালোচক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪—১৮৯৪)। নাট্যকারের নাম দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০—১৮৭৩)। যে নাটকটি নিয়ে তিক্ত সমালোচনা এবং সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রশস্তি—সেই নাটক "সধবার একাদশী"।

প্রথম নাটক "নীলদর্পণ" লিখেই দীনবন্ধুর সব চেয়ে বেশি খ্যাতি। "নীলদর্পণ" রচয়িতারূপে আজও তিনি সর্বত্র পরিচিত, যদিও—"নীল-দর্পণে"র প্রসিদ্ধি শুধু নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়, অন্য কারণে—সে কথা সবাই জানেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন "লীলাবতী"-ই দীবনন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক। কারণ নাট্যকার খুব ধীরেসুস্থে এটি লিখেছিলেন এবং ওঁর অন্য নাটকগুলির তুলনায় "লীলাবতী"তে দোষত্রুটি অনেক কম।

কিন্তু আমরা মনে করি, নীলদর্পণও নয়, লীলাবতীও নয়—অনেক দোষ থাকলেও "সধবার একাদশী"-ই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক।

এযুগের পাঠককে জানিয়ে রাখি, মহৎ প্রকৃতির দীনবন্ধু মিত্র-র রাগ কিন্তু মোটেই বেশীদিন থাকেনি। কারণ তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগেই (১৮৭৬ খৃঃ) দেখা গেল তিনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের ওপরই একটি কবিতা লিখে ফেলেছেন। দীনবন্ধু কবি ছিলেন না, এ কথা আগেই বলেছি। এ কবিতাটিও উচ্চশ্রেণীর নয়। কিন্তু তিনি হৃদয়ের যে আন্তরিক অনুরাগ নিয়ে কবিতাটি লিখেছিলেন—তার অনাবিল সৌরভ আজও অম্লান। ছোট্ট কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করছি—

'বিনোদ বাসনা লালবিহারী ধীমান,/সরল স্বভাব ধীর গভীর বিজ্ঞান/অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর/মধুর বচনে তুষ্ট মানব নিকর/খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বী ধর্ম সুধাপান/অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।'

●

ভণ্ডুল ভ্রমণের বিড়ম্বনা

সময়টা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর। শান্তিনিকেতনে পূজোর ছুটি সবে শুরু। কোথাও একটু ঘুরে আসার কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এলাহাবাদে নিরিবিলি কয়েকটা দিন কাটানোই স্থির করলেন। হঠাৎ ছোট মেয়ে মীরা ও জামাই নগেন্দ্রনাথের চিঠিতে জানা গেল ওঁদের বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে। শোনামাত্র তিনিও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন, বুদ্ধগয়া যাবেন। ভ্রমণসূচী সামান্য বদলানো হল। বুদ্ধগয়ায় কয়েক দিন কাটিয়ে তারপর এলাহাবাদ।

রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন তিপ্পান্ন। জগৎজোড়া খ্যাতি বলতে যা বোঝায়, তিনি তার কাছাকাছি। এগার মাস আগে পেয়েছেন নোবেল প্রাইজ। "এশিয়ার এই আশ্চর্য প্রতিভা"র পরিচয় নিতে ইয়োরোপ অত্যন্ত উৎসুক। কেবল ওঁর সাহিত্যসৃষ্টিচিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচয় নয়, ব্যক্তি-মানুষটি কেমন জানতেও ইয়োরোপে আগ্রহ বাড়ছে ক্রমেই। অবশ্য যাঁকে ঘিরে এ ঔৎসুক্য, তিনি নিজে কিন্তু অবিশ্বাস্য রকম প্রশান্ত, স্থির। রসজ্ঞ যথার্থ গুণগ্রাহীর প্রশংসায় খুশী হন তা ঠিক, কিন্তু উন্মাদনার মাতামাতি তাঁকে ছুঁতেও পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তো পৌঁছোলেন গয়ায়। দিনটা শুক্রবার, সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭২—১৯৩২ খ্রীঃ) তখন ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিশ করেন গয়ায়। সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় চাকরিতে বদলির পর গয়াতেই আছেন। সাহিত্যসংস্কৃতি-প্রেমিক আরো কয়েক-জন বাঙালীরও বাস। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে সবাই খুব খুশী। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যে ওঁর কাছে আসেন। গল্পে আলোচনায় প্রথম দুদিন কাটলো চমৎকার।

রোববার সকালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসে একখানি উপন্যাস উপহার দিলেন। অবশ্য নতুন বই না। নতুন সংস্করণের বই। উপন্যাসটির নাম 'রমাসুন্দরী'। বছর দশেক আগে বেশ কয়েক মাস ধরে এটি

'ভারতী'তে ধারাবাহিক চলেছিল। বই আকারে ছাপা হতে কয়েকটি সংস্করণ হয়। নতুন সংস্করণের কিছু কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে কলকাতা থেকে আগের দিন প্রভাতকুমারের কাছে পৌঁছেছে। তাই 'রমাসুন্দরী'কে সকালবেলাই নিয়ে এলেন। বইটি নেড়েচেড়ে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, তোমার এ উপন্যাসটি এর আগে কি পড়েছি, প্রভাত? আমার মনে হয় যেন অনেকদিন আগে পড়েছি। নামটা চেনা-চেনা লাগছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বোধ হয় পড়েছেন। প্রথম সংস্করণের কপি আপনাকে বিরজিতালাও-এর বাড়িতে দিয়ে এসেছিলাম।

বইটি নিজের কোলের ওপর নামিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, আচ্ছা, আজ দুপুরে পড়ে দেখব'খন আবার।

বেশ কিছুদিন এখানে বৃষ্টি-টিষ্টি হয়নি। বেলা এগারটার পর থেকে ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ, কিন্তু এখন এই সকাল আটটায় আবহাওয়া খুব মোলায়েম। বাড়ির বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ বেতের চেয়ারে বসে। তাঁর পরনে সাদা সূতীর পাঞ্জাবি ও ধুতি। আশেপাশের চেয়ারগুলি ভরতি। যাঁরা আসার, তাঁরা সবাই হাজির। কথাবার্তার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমি কাল, সোমবার রাত আটটার ট্রেনে এলাহাবাদ চলে যাব।

কথাটা শুনে ঠিক পাশে বসা এক ভদ্রলোক চমকে বললেন, সে কি রবিবাবু—

বাঙালী এই ভদ্রলোক স্থানীয় একজন মুরুব্বী। বয়েস আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। বেশ ভারিক্কি চালচলন। লম্বাচওড়া চেহারা। সব সময়ে পরিপাটী ঝকঝকে জামাকাপড়। বাঁ হাতের আঙুলে তিনটে সোনার আংটি, জামার পকেটের মধ্যে কালো কার দিয়ে বাঁধা দামী ঘড়ি। কিসের যেন ব্যবসা করেন। মুখে খই ফুটছে। কথা অত্যন্ত বেশি বলার অভ্যেস। অবশ্য গুছিয়ে সুন্দর ভাবে কথা বলতেও জানেন। শুনতে বেশ লাগে। দোষের মধ্যে হামবড়াই ভাব, আত্মঅহঙ্কার আর কি, কথাবার্তায় বড্ড প্রকাশ পায়—যাকগে সেটা ধর্তব্য না। লোকটি খুব করিৎকর্মা, ওস্তাদ হিসেবে পরিচিত। এঁকে আমরা 'ক'বাবু নামে ডাকব।

সে কি রবিবাবু, আপনি 'বরাবর' পাহাড়ের গুহা দেখবেন না?

সে আবার কি!

গয়া থেকে খানিকটা দূরে খুব নির্জন জায়গায় তিনটে পাহাড় আছে। তাদেরই নাম 'বরাবর'। তিনটে পাহাড় পাশাপাশি। মধ্যিখানের যে পাহাড়টা, তাতে কয়েকটা গুহা। অদ্ভুত ধরনের। আশ্চর্য! সে গুহার দেয়ালগুলো, রবিবাবু, বললে বিশ্বাস করবেন না, একদম ঠিক কাঁচের মতো। হাত দিন, পিছলে হড়কে যাবে! গুহাগুলো আধো অন্ধকার। ঢুকলেই মনে হয় এ কোথায় এলাম—

কথাগুলো শুনে রবীন্দ্রনাথের বড্ড ভালো লাগল। তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমারের দিকে তাকিয়ে বলেন, কি হে, প্রভাত?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। আমি অবশ্য যাইনি এখনো। কিন্তু শুনেছি, গুহাগুলো দেখবার জিনিস; পাঁচ-ছটা গুহা আছে সম্ভবত।

তুমি যাওনি কেন?

আজ্ঞে, যাতায়াতের অসুবিধে রয়েছে। তাই যাব-যাব করেও ঠিক হয়ে ওঠেনি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন, আমি গেছি একবার। খুব সুন্দর নির্জন জায়গা। গুহাগুলোরও বৈচিত্র্য আছে। কোনো ছবি খোদাই কিংবা আঁকা না থাকলেও গুহার দু'দিকের দেয়াল সত্যি কাঁচের মতো পালিশ। এরকম দেখিনি কোথাও।

গুহায় কেউ থাকতেন নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই শুনেছি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ওখানে থাকতেন কয়েক-শো বছর আগে। এখন অবশ্য সব ফাঁকা। মাঝে-মধ্যে কেউ কেউ দেখতে যায়।

'ক'বাবু সোৎসাহে বললেন, চলুন রবিবাবু, আমরা দেখে আসি। গয়ায় বেড়াতে এলেন অথচ 'বরাবর' পাহাড় দেখা বাকি রইলো এটা যেন আমার কেমন কেমন লাগছে। পাহাড়টার পাশে সুন্দর ঝরনা। অনেক উঁচু থেকে জল পড়ে। ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল। ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী ওখান দিয়েই বার হয়েছে। আশেপাশে একদম চুপচাপ। ফাঁকা মাঠ। পাহাড় উঁচু। কিন্তু ওঠার রাস্তা চমৎকার। বাঁকে বাঁকে

জিরিয়ে নেওয়া যায়। আমি তো এযাবৎ পনেরোবার গেছি ওখানে।

আর বেশি বলার দরকার হল না। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ততক্ষণে যথেষ্ট বেড়ে গেছে। তিনি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেন, কি বলেন?

আজ্ঞে, জায়গাটা ভালো সে কথা মানি। কিন্তু যাতায়াতের বড্ড অসুবিধে যে। যানবাহন বলতে পালকি আর গরুর গাড়ি। রাস্তা কিন্তু অনেক দূর। রোদের তেজও যথেষ্ট।

পথ কেমন?

পথ বলতে তেমন কিছু নেই, মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তবে বেশি এবড়ো-খেবড়ো না। পাথুরে জমি বলে ওদিকটা চাষবাস কম, মানুষের বসতি—গ্রাম অনেক তফাতে তফাতে। পাথর ছড়ানো ফাঁকা জায়গা বেশি। এ গরমে অত দূর নাই বা গেলেন আপনি। তা ছাড়া সঙ্গে কন্যাকে নিয়ে যাবেন, তিনি যদি পথেই অসুস্থ হয়ে পড়েন?

প্রভাতকুমারেরও ইচ্ছে না রবীন্দ্রনাথ অতো রোদের মধ্যে টো টো করে বরাবর পাহাড় দেখতে যান। দুপুরের দিকটা খুবই গরম হাওয়া বয় ওদিকে।

তিনি বলেন, আর তা ছাড়া আপনি যে বলছিলেন কাল রাত আটটার গাড়িতে এলাহাবাদ যাবেন? এর মধ্যে আর সময় কোথা?

'ক' বাবু উৎসাহের চোটে হাতমুখ নেড়ে বলে ওঠেন, বিলক্ষণ! সময় আমি করে দিচ্ছি। মানে, পুরো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আর কি। আপনাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ওসব এলাকায় আমার হাতের মুঠোয় সব কিছু। শুধু হুকুমের ওয়াস্তা। রবিবাবু, আপনার সঙ্গে কজন যাবেন? কালকে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কাল?

হ্যাঁ, কাল। এমনভাবে আমি অ্যারেঞ্জ করে দেব যাতে রাত আটটার গাড়িতে এলাহাবাদ রওনায় কোনো বাধা পড়বে না।

প্রভাতকুমার ও বসন্তবাবু দুজনেরই খুব লোভ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেতে। কিন্তু সোমবার ওঁদের কারুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

আদালতে একটা জরুরী মোকদ্দমা নিয়ে প্রভাতকুমার কাল পুরো বিকেল চারটে অবধি আটকা। আর বসন্তবাবুর অফিসে ঐদিন বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসেব-নিকেশ চেকিংয়ের ঝামেলা আছে।

শান্তিনিকেতন থেকে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার এবং শিক্ষক জগদানন্দ রায়ের ছেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই গিয়েছিলেন গয়াতে। আর, মেয়ে জামাই ও নাতি তো ছিলেনই।

'ক' বাবু হিসেব শুনে বললেন, মাত্র ছ'জন? ও তো কিছুই না, বারো জন হলেও কিচ্ছু ভাববার ছিল না। আমি আজ সন্ধ্যের মধ্যে একদল লোক 'বরাবর' পাহাড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা আজ ওখানে তাঁবু খাটিয়ে রাত্তিরে থাকবে। কাল সকালে উঠে উনুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না শুরু করে দেবে। আপনাদের 'বরাবর' পাহাড় যাওয়ার জন্য তিনটে পালকি, দুটো হাতি কাল ভোরবেলা থেকে রেডি রাখছি। পালকি তিনটে মেয়ে, জামাই আর আপনার। নাতি তো বাচ্চা—মায়ের সঙ্গে এক পালকিতে এঁটে যাবে। আর বাকি যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য দুটো হাতি।

কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত বিস্মিত। বলেন কি! অতো আয়োজন এই কম সময়ের মধ্যে করতে পারবেন?

সব যে আমার হাতের মুঠোয়, রবিবাবু। সকাল সাড়ে আটটা এখন। সারাদিন সামনে পড়ে আছে। এও না পারলে আর পারবোটা কি? এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে পারি। যাকগে, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। তা হলে কথা তো পাকা? আপনি যাচ্ছেন?

রবীন্দ্রনাথ তাকালেন প্রভাতকুমার ও বসন্তবাবুর দিকে। 'ক' বাবুর সুন্দর ব্যবস্থার পরিকল্পনার প্রথমটুকু শুনেই ওঁদের আগের তেজোঁ আপত্তির ভাব অনেক নরম। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের উৎসুক চাউনি ওঁরা বুঝেছেন।

প্রভাতকুমার উত্তর দেন, 'ক'বাবু যা বললেন, তাতে তো আপত্তির কারণ দেখি না—

রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়ে বলেন, বেশ, কাল তা হলে 'বরাবর' পাহাড়

ঘুরে আসা যাক।

বসন্তবাবুর খুঁতখুঁত ভাবটা পুরো যায়নি। 'ক'বাবুকে জিজ্ঞেস করেন, কালকের যাওয়া-আসাটা কখন এবং কিরকম ভাবে, তা আরো স্পষ্ট জানতে পেলে ভালো হতো।

বাঃ, জানবেন বই কি! আপনাদের সঙ্গে যখন নানান কথা বলছিলাম, ব্রেনটা কিন্তু আমার ঠিকঠাক কাজ করে যাচ্ছিলো। তাই ভ্রমণ-চার্টটা আমি মনের মধ্যে এরি ফাঁকে ছকে নিয়েছি। চার্টটা ফলো করলে আর ঝামেলা নেই। আমার কাজকর্ম সব সময়ে প্ল্যান মাফিক। শুনুন তা হলে—ভোর ছ'টায় গয়া স্টেশন থেকে বাঁকিপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়ে। আমরা তাতে উঠবো। ছুটো স্টেশন পার হয়ে আধ ঘণ্টা পরে 'বেলা' স্টেশন। আমরা 'বেলা' স্টেশনে নামবো। ঐ স্টেশনের পাশে মাঠে পালকি আর হাতি দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোতে চাপতে, ধরুন পনেরো মিনিট সময় আরো নষ্ট হলো। তা হলে রওনা পৌনে সাতটায়। পথে লাগবে ছু'ঘণ্টা।—

উপস্থিত তেরো-চোদ্দজন শ্রোতার মধ্যে কেবল বসন্তবাবু এবং আরেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের 'বরাবর' পাহাড় ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁরা রীতিমতো সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মন্তব্য করেন মাত্র ছু'ঘণ্টায় 'বেলা' স্টেশন থেকে 'বরাবর' পাহাড় পৌছে যাবেন? অতো তাড়াতাড়ি? না 'ক'বাবু না। সময় অবশ্যই আরো বেশি লাগবে।

'ক'বাবু পরম আপ্যায়িতের হাসি হেসে জবাব দেন, বেশি লাগবে কেন? বরং আরো কম লাগবে বলুন! আমার পালকিওয়ালারা যেমন ওস্তাদ, হাতি ছুটোও তেমনি। খুব জোরে যায়। দেড় ঘণ্টাতেই পৌছোনো উচিত, হ্যাঁ দেড় ঘণ্টা। আমি তবুও কিছু বাড়তি সময় যোগ করে ছু'ঘণ্টা রাখলুম।

আচ্ছা, তারপর?

সকাল পৌনে নটায় 'বরাবর' পাহাড়ে পৌছোলাম। তারপর পাহাড়ে উঠে ঘণ্টা চারেক ধরে পাহাড় এবং গুহাগুলো দেখলাম। পাহাড়ের নিচে, আশেপাশে, যদি কিছুক্ষণ ঘুরেটুরে দেখতে ইচ্ছে হয়,

তাও ঘুরলাম। এবার দিব্যি চান সেরে খাওয়াদাওয়া করে দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম। পৌনে চারটের সময় ফের 'বরাবর' পাহাড়ের তলা থেকে রওনা দিয়ে বিকেল পৌনে ছ'টার সময় 'বেলা' স্টেশনে চলে এলাম। ওয়েটিং-রুমে একটুখানি বসলাম। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়ে 'বেলা' স্টেশন ছুঁয়ে গয়ার দিকে আসার ট্রেনও রয়েছে। তাতে চেপে সন্ধ্যে সাতটায় গয়া স্টেশনে ফিরে এলাম। এলাহাবাদের ট্রেন তো রাত আটটায় ছাড়ে। তার অনেক দেরি।

একটানা অতক্ষণ কথার পর দম নিতে 'ক'বাবুকে একটু থামতে হলো। বারান্দাসুদ্ধু সবাই নিবিষ্টচিত্তে ওঁর অনর্গল বাক্যস্রোত শুন-ছিলেন। ওঁর বক্তব্যের প্রতি পদক্ষেপে টাইমের নিখুঁত ছকবাঁধা হিসেবে কারু কারু মাথা তখন চন্‌চন্‌ করছে। সকলের চোখেমুখে প্রশংসার আভাস।

জনৈক শ্রোতা গলাখাঁকরি দিয়ে প্রশ্ন করেন, তা হলে 'বরাবর' পাহাড়ের নিচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা অনেকের জন্যে হবে বলুন?

নিশ্চয়। আমার স্পেশাল গেস্ট রবিবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা ছ'জন, ওঁর নাতিকে নিয়ে সাতজন ধরুন, আমি একজন—আটজন। আর, বাইরের লোক বলতে, দুজন পেয়াদা, পালকি পিছু ছ'জন বাহক—তা হলে আঠারো জন, চারজন মাহুত। তা ছাড়া আগের দিন, মানে আজ সন্ধ্যেবেলা আর কি, গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি করে তাঁবু, বাসনপত্র, কয়লা, খাবার-দাবার মশলাপাতি নিয়ে যাবে দু'জন রাঁধুনে ব্রাহ্মণ, তিনজন যোগানদার—আর হ্যাঁ দু'জন গাড়োয়ান—এই একত্রিশজন।

জনৈক শ্রোতা, যিনি কিনা মাত্রাতিরিক্ত সাবধান প্রকৃতির, বললেন, ও ব্বাবা, অতো লোকের ব্যাপার, শেষে সব ভণ্ডুল হবে না তো 'ক'বাবু? বিশেষ করে রবিবাবু যাচ্ছেন, ওঁর কোনো রকম অসুবিধে হলে সে লজ্জা কিন্তু গয়াবাসী আমাদের সব বাঙালীর—

হাত নাড়তে নাড়তে 'ক'বাবু বলেন, আরে, সেটা আমি কি জানি না? রবিবাবু যাচ্ছেন বলেই তো আয়োজনটা বেশি! মশাই, নির্ভয়ে থাকুন। আমি আজ দুপুর দুটোর ট্রেনে 'বেলা' স্টেশন যাচ্ছি, বুঝলেন

আমি নিজে। সেখানে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে পাঁচটার ট্রেনে ফিরে আসব।

'বরাবর' পাহাড় দেখার সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হবার পর আলোচনার গতিমুখ অন্য খাতে চলে গেল। প্রধানত সাহিত্য আলোচনা, তারপর টুকিটাকি আরো নানা গল্প, শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ, কলকাতার হালচাল, প্রবাসে বাঙালীর জীবন ইত্যাদি নিয়ে জমাটি আসর চললো প্রায় বারোটা অবধি। এর পর যে যার বাড়ি ফিরলেন।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন শিক্ষিত যুবক। (এরপর যে আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হবে, তার মূল সাক্ষী ইনিই। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণটি তিনি লিখে গেছেন।) গয়াতেই থাকেন। চাকরি করেন। বয়েস সাতাশ-আটাশ। খুব রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য খুঁটিয়ে এবং পরমানন্দে উপভোগ করলেও ইতিপূর্বে কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ একবারই হয়েছিল তাঁর। এবার গয়ায় শুক্রবার ও শনিবার দু'বেলাই এসে দেখা করেছেন। কিন্তু হঠাৎ কাজে আটকে যাওয়ায় রোববার সকালের বৈঠকে আসতে পারেননি।

কাজেই 'বরাবর' পাহাড় যাত্রার খবরটা তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেলেন রোববার বিকেলে। এও শুনলেন যে, প্রভাতকুমার ও বসন্তবাবু সোমবার ভোরে গয়া স্টেশনে আসবেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের ছ'টার ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য। প্রভাতকুমারের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের খুব হৃদ্য সম্পর্ক। সতীশচন্দ্রের টপ করে বলে ফেলেন, দাদা, আমিও আপনাদের সঙ্গে স্টেশন যাবো রবিবাবুকে তুলে দিতে।

বেশ তো, আমি আর বসন্তবাবু টমটম (ঘোড়ার গাড়ি) করে স্টেশন যাবো। তা যাওয়ার পথে তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়াবো'খন। তোমার কিন্তু স্যাড়ে পাঁচটায় রেডি থাকা চাই।

সোমবার সকাল, পাঁচটা চল্লিশ। প্রভাতকুমার, বসন্তবাবু, সতীশচন্দ্র গয়া স্টেশনে হাজির। এক কাপ চা-ও কেউ খাননি। সতীশচন্দ্রের চায়ের নেশাটা একটু বেশি। রবীন্দ্রনাথ তখনো এসে পৌছোননি দেখে, চট করে দু ভাঁড় চা খেয়ে এলেন।

ছ'টা বাজতে পনেরো মিনিট। রবীন্দ্রনাথ এসে পৌছোলেন। সঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, জগদানন্দ রায় মশাইয়ের ছেলে ত্রিগুণানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের পরনে গরদের ধুতি। গায়ে গরদেরই পিরহান (ফতুয়া ধরনের জামা), পায়ে চটি। অপূর্ব দেবমূর্তি। স্টেশন একেবারে আলো করে দাঁড়িয়ে। যারা ওঁর পরিচয় কিছুমাত্র জানে না বা জানার সম্ভাবনাও যাদের নেই কিংবা যারা জেনেও কিছুই বুঝতে পারবে না—গয়া স্টেশনে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা নানান ধরনের লোক ভিড় বেঁধে হাঁ করে এই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখতে লাগলো।

প্রভাতকুমারকে দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হেসে বলেন, এসে গেছ ? কখন এলে ?

আজ্ঞে, কয়েক মিনিট আগে এলাম। কিন্তু কই, আপনার মেয়ে-জামাই-নাতি কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, মেয়ের জ্বর হয়েছে। নাতির কান ফুলেছে, ওর গায়েও জ্বর। কাজেই ওদের দুজনের আসা সম্ভব না। জামাই ওদের দেখাশোনার জন্য রয়ে গেল।

বেশি রকম কিছু নাকি ?

না, তেমন কিছু না। ওরা আজ সন্ধ্যেয় মালপত্র নিয়ে সোজা এই স্টেশনের ওয়েটিং রুমে চলে আসবে বলে দিয়েছি। 'বরাবর' পাহাড় দেখে গয়া স্টেশনে ফিরে আমি আর বাড়ি যাব না। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে চলে আসব। 'বেলা' স্টেশন থেকে এখানে ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা। এলাহাবাদের গাড়ি যখন রাত ৮টাতেই ছাড়ছে, তখন একটুখানি সময়ের জন্য বাড়ি যাওয়া-আসার ঝামেলা না বাড়িয়ে বরং ওয়েটিং রুমে রয়ে যাওয়াই ভালো।

বসন্তবাবু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে বলেন, প্রভাত, তুমি আমাদের এলাহাবাদ যাওয়ার টিকিট কেটে রেখো তো। মেয়ে, জামাই, নাতি, চারুবাবু আর আমি—সাড়ে চারখানা টিকিট। বাকিরা এলাহাবাদ

যাচ্ছে না, আরো ক'টা দিন গয়ায় থেকে কলকাতা ফিরবে।

যে আজ্ঞে, টিকিট কেটে রাখব।

বাঁকিপুর প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওঁরা সকলে কথা বলতে বলতে সেদিকেই এগোলেন। প্রভাতকুমার হাসতে হাসতে বলেন, রবিবাবু, আপনি তো আজ রাত আটটায় এলাহাবাদ রওনা হবেন, তার ঠিক কুড়ি মিনিট পরে হয়তো আমাকেও উলটো দিকে রওনা হতে পারে।

উলটো দিকে ? কি রকম ?

হয়তো আজ রাতের গাড়িতেই কলকাতা যাবো। হাইকোর্টে একটা জরুরী আপিল রয়েছে, মক্কেলের টেলিগ্রাম দুপুর নাগাদ আসার কথা। টেলিগ্রামটার অপেক্ষাতেই আছি। ওটা এলেই—

'ক'বাবু ইতিমধ্যে হাজির। পরনে খুব মাড়া দেওয়া জামা-কাপড়। আয়নার মতো পালিশ জুতো। মুখে বেশ বিগলিত হাসি। সঙ্গে মাথায় বিরাট পাগড়ি বাঁধা দুজন পেয়াদা। তাদের একজনের হাতে একটা পোঁটলা।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের পছন্দমতো কামরায় বসানো হলো। গাড়ি ছাড়তে আর তিন মিনিট। সতীশচন্দ্রের মাথায় ততক্ষণে একটি নতুন পরিকল্পনার উদয় হয়েছে। ইতিপূর্বে 'বরাবর' পাহাড় দেখতে পাওয়ার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। তাই তিনি ফিসফিস করে প্রভাতকুমারকে বললেন, দাদা, কাজটাজ না হয় আজ থাক, আমরাও আজ যাই চলুন!

সে কি হে, কি বলছো ?

হ্যাঁ দাদা, ভেবে দেখুন দুটো হাতি আর তিনটে পালকি তো 'বেলা' স্টেশনে অপেক্ষা করছে। রবিবাবুর মেয়ে-জামাই এলেন না, ওগুলো তো বেকার ফাঁকা যাবে তাহলে ? একটা হাতিতে ওঠার মতো যথেষ্ট লোক নেই তায় দুটো হাতি! তাই বলছি, চলুন আপনি, বসন্তবাবু আর আমি তিনজনে রবিবাবুর সঙ্গে 'বরাবর' পাহাড় চলে যাই ? রবিবাবু, আপনি আর 'ক'বাবু, তিনজনে পালকিতে আর আমরা বাকিরা হাতিতে—

ওঁর কথায় বাধা দিয়ে প্রভাতকুমার বলেন, যদি কোনোক্রমেও যাওয়া সম্ভব হতো, তাহলে কি আমরা যেতাম না? কিন্তু আজ উপায় নেই, সতীশ।

তাহলে, দাদা, আমি একলাই চলে যাই? আমার কোনো অসুবিধে নেই। রবিবাবুর সঙ্গে যেতে পারবো—

বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা। তাহলে তুমি যাও। রবিবাবুর সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর রেখো একটু।

কামরার পাদানিতে দাঁড়িয়ে 'ক'বাবু কথা শুনছিলেন দুজনের। সতীশচন্দ্র ওঁর দিকে তাকাতেই উনি সম্মতিতে ঘাড় নাড়লেন।

ওদিকে ট্রেনও ততক্ষণে নড়-নড়। রকেটের বেগে ছুটে সতীশচন্দ্র নিজের একখানা টিকিট কেটে এনে চলন্ত ট্রেনের কামরায় উঠে গেলেন একলাফে। জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, দাদা, আমার বাড়িতে একটু খবরটা দিয়ে দেবেন।

ট্রেনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গয়া স্টেশন চত্বর মিলিয়ে যায়।

অত সকালের ট্রেন, তাই কামরাটিতে ওঁদের গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। যে যার আরাম করে বসলেন।

ফাউণ্টেন পেনের চলন সেকালে খুব কম। লোকে সাধারণত বাড়িতে বা অফিসে কিছু লিখলে কালির দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্টিলের নিবওলা হ্যাণ্ডেল কলমে লিখতেন। আর বাইরে কি রাস্তায় লিখতে গেলে ভরসা ছিল পেনসিল।

রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় কোথাও বেরোলে খাতা এবং পেনসিল সব সময়েই সঙ্গী। লেখার সুবিধে ও পোক্ত করবার জন্য পেনসিলের পেছন দিকটা ধাতু দিয়ে মুড়ে নিয়েছিলেন। যথারীতি এবার তিনি খাতা পেনসিল নিয়ে নিমগ্ন হন অবিলম্বে। গাড়ির যথেষ্ট দুলুনির মধ্যে পেনসিল দ্রুত খসখস এগিয়ে চললো। সতীশচন্দ্র আর কৌতূহল সামলাতে পারেন না। অতিরিক্ত কৌতূহল ভদ্রতাসম্মত নয় জেনেও নিজের সিট ছেড়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের হাতের খাতায় উঁকি দিলেন। দেখতে দেখতে একটি নতুন কবিতার জন্ম।

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো,
কোন অনাদিকালের আশা
হেথায় বুঝি সব পুরালো!
কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।
আবার কবে নবীন ফুলে
ভরে নূতন দিনের সাজি
পথের ধারে তরুমূলে
প্রভাতী সুর ওঠে বাজি।
কেমন করে নূতন সাথী
জোটে আবার রাতারাতি,
দেখি রথের চূড়ার 'পরে
নূতন ধ্বজা কে উড়ালো।

ঠিক সাড়ে ছটা। 'বেলা' স্টেশনে দু মিনিটের জন্য গাড়ি থামতে চটপট সবাই নেমে এলেন। সবচেয়ে আগে 'ক'বাবু, পিছনে বাকিরা। সামান্য এগিয়ে যেতে স্টেশন চত্বর শেষ। সামনের মাঠে একটি হাতি দাঁড়ানো। তার আশেপাশে কয়েকটি লোক খৈনি সহযোগে গল্পে মশগুল। কিন্তু পালকি কই?

'ক'বাবু লোকগুলিকে জিজ্ঞেস করেন, 'বরাবর' পাহাড়ে যেতে হাতি নিয়ে কারা এসেছো?

দুজন লোক শশব্যস্তে উঠে ঘন ঘন সেলাম করে বলল, আমরা এসেছি হুজুর।

দুটো হাতি আসার কথা ছিল, একটা কেন?

তা তো বলতে পারবো না হুজুর। আমাদের তো একটা হাতিই

আছে। মুনশীজীর কথামতো এটাকে নিয়েই চলে এসেছি।

যাক গে, একটা হাতিতে কাজ চলে যাবে। কিন্তু তিনটে পালকির কি হল? এখুনি আসবে তো?

পালকি, হুজুর? আজ্ঞে, পালকির কথা আমরা কিছু জানি না।

অ্যাঃ, সে কি! তোমরা জানো না, তবে কে জানে?

মালকোঁচা ধুতি, কাঁধে গামছা, পায়ে নাগড়া, শুঁটকো মতো একটা লোক এতক্ষণ নির্লিপ্তের মতো বসেছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলল, আজ্ঞে হুজুর, ওরা জানে না। আমি জানি। কাছেই একটা গ্রামে মোড়লের কাছে মুনশীজী তিনখানা পালকির জন্য চিঠি লিখে দিয়েছেন। পালকি যোগাড় হলেই এসে যাবে হুজুর।

সে গ্রামের নাম কি? এখান থেকে কদ্দুর?

আজ্ঞে হুজুর, তা জানি না। তবে পালকি এক্ষুনি এলো বলে।

'ক'বাবুকে খানিক আশ্বস্ত দেখালেও সতীশচন্দ্র কিন্তু মোটেই স্বস্তি পান না। ব্যাপারটার শুরুতেই কেমন যেন গোলমাল ঠেকে। আরো দু'চারটি জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি জানতে পারলেন, গয়ানিবাসী এক জমিদার 'ক'বাবুর বিশেষ অনুগত বন্ধু। সেই ভদ্রলোকের জমিদারী অন্য এলাকায় হলেও এদিকেও তাঁর অধিকারে কয়েকখানা ছোট গ্রাম রয়েছে। 'ক'বাবুর অনুরোধ শুনে জমিদার ভদ্রলোক তখুনি, কাল রাত্রে, তাঁর মুনশীজী (নায়েব) মারফৎ ঐ গ্রামগুলির মোড়লদের কাছে হাতি আর পালকির জন্য জরুরী পরোয়ানা পাঠান। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী একটা হাতি এসেছে এবং তিনটে পালকি আসছে। এটাও বোঝা গেল যে, হাতি আর পালকি যে কোনো একটা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়নি। হাতিওলারা এক গ্রামের, পালকিওয়ালারা আরেক গ্রামের। সেই জন্য কেউ কারুর খবর জানে না।

সতীশচন্দ্র ভাবলেন, যাক, তাহলে আর অসুবিধের কারণ নেই। কিন্তু আরো দুটি কথা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে এলো যে, 'ক'বাবু রোববার দিন, ওঁর কথামতো, দুপুর দুটোর গাড়িতে 'বরাবর' পাহাড় যাত্রার বন্দোবস্ত করতে 'বেলা' স্টেশনে আদৌ আসেননি। তার বদলে

তিনি সর্টকাটে গয়ানিবাসী জমিদার বন্ধুকে পাহাড় দেখার বন্দোবস্তের অনুরোধ জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন। এবং 'সব আমার হাতের মুঠোয়' বলে 'ক'বাবু অনেক বড়াই করলেও, আসলে পুরো ব্যবস্থাটাই তাঁর হাতের মুঠির বাইরে। কারণ তিনি সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টটার জন্য অন্য আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল।

যাই হোক, 'ক'বাবুকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করার কি দরকার? ভুলত্রুটি কার না হয়?

'ক'বাবু এবার ওঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, ওহে সতীশ, পালকি যখন এখনো আসেনি, তখন রবিবাবুকে দাঁড় করিয়ে রাখাটা উচিত হয় না। ওঁকে বরং আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে নিরিবিলিতে বসিয়ে আসি। পালকি এলেই ওঁকে ডাকবো। তিনটে পালকি—একটাতে উনি, একটাতে তুমি, আরেকটাতে আমি। আর ছাখো সতীশ, হাতি যখন এসেই গেছে তখন আর চারুবাবুদের খামোখা দাঁড় করিয়ে কি লাভ? মাহুত তুজনের সঙ্গে ওদের তিনজনকে আগেই পাঠিয়ে দিই? বেশ হাত-পা খেলিয়ে আরামে ওঁরা চলে যাবেন। আর আমাদের কাজও অনেকটা এগিয়ে রইলো—

খুব যুক্তিযুক্ত পরামর্শ। রবীন্দ্রনাথকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে আসার পর সতীশচন্দ্র 'ক'বাবুকে ডেকে বলেন, 'ক'বাবু একটা কথা বলছিলাম—

হ্যাঁ, বল, বল।

ওঁদের রওনা করিয়ে দেবার আগে কিছু জলখাবার খাইয়ে দেওয়াই বোধ হয় ভালো। তু'ঘণ্টার পথ। ওঁরা কেউ কিছু খেয়ে আসেননি। স্টেশনে তো দেখলাম ওঁদের খাওয়ার উপযুক্ত কিছুই নেই।

জলখাবার আমি সঙ্গেই এনেছি। আমার সব দিকে নজর আছে হে, সতীশ। ওরে, ঐ তোর হাতের পোঁটলাটা এদিকে নিয়ে আয় তো।

যে পেয়াদার হাতে একটা পোঁটলা ছিল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। সতীশচন্দ্র পোঁটলাটা খুললেন। পোঁটলাটা বড়, টিফিনবাক্সোও বড়, কিন্তু খুলে দেখা গেল জলখাবারের পরিমাণটা বড্ড কম। গুটি ছয়েক সন্দেশ, আর গোটা পঁচিশ আঙুর, আধপোও ওজন হবে না।

'ক'বাবু বললেন, বুঝলে সতীশ, ইচ্ছে করেই বেশি আনিনি। বার বার হেভি জলখাবার শরীরের পক্ষে ভাল না। 'বরাবর' পাহাড়ে ওঁরা পৌঁছোনোমাত্র আরেক প্রস্থ জলখাবারের ব্যবস্থা। লুচি, হালুয়া, ক্ষীরের বরফি, ফল, সরবত সব কিছু যেন ঠিকমতো দেওয়া হয় মহারাজদের (রাঁধুনে ব্রাহ্মণ) ওপর সেরকমই হুকুম। খেয়ে নিয়ে তবেই গুহা-গুলো দেখতে যাবেন। তাঁবু খাটিয়ে দুজন রাঁধুনে আর তিনজন যোগান-দার এতক্ষণে রান্না চাপিয়েছে।

বড্ড কম জলখাবার দেখে সতীশচন্দ্রের ক্ষুণ্ণ ভাবটা 'ক'বাবুর কথা শুনে কেটে গেল। চারুবাবু, অসিতবাবু ও ত্রিগুণানন্দ দুটি করে সন্দেশ এবং এক এক ঘটি জল খেয়ে বেশ খুশী মুখে হাতির পিঠে ওঠেন।

চারুবাবু জিজ্ঞেস করেন, রবিবাবুও নিশ্চয়ই আর আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে পারবেন ? কি বলেন ?

'ক'বাবু অমায়িক হেসে জবাব দেন, সে আর বলতে !

ওঁরা চলে গেলেন। ঘড়িতে তখন ঠিক সোয়া সাতটা।

'ক'বাবু বলেন, চলো সতীশ, এবার ওয়েটিং রুমে যাওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে বসে আছেন। আঙুরগুলো ওঁর সামনে রাখতে প্রথমটা খেতে চাননি। বললেন, আমি সকালে কিছু খাই না।

চাপাচাপির পর গোটা কতক আঙুর খেলেন। তারপর বললেন, এবার তাহলে আমরা রওনা হই ? আর দেরির কি দরকার ?

আজ্ঞে চারুবাবুরা হাতিতে করে রওনা দিলেন, কিন্তু আমাদের পালকি এখনো এসে পৌঁছোয়নি। কোনো ঝামেলায় আটকে গেছে আর কি, যাই হোক আসবে এখুনি। আপনি ততক্ষণ একটু বসুন দয়া করে। পালকি এলেই আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো। চলো, সতীশ, বাইরে বোধ হয় পালকি এলো, দেখে আসি।

সতীশচন্দ্রকে নিয়ে 'ক'বাবু আবার স্টেশন চত্বরের বাইরে মাঠে এসে দাঁড়ান। চতুর্দিকে ধু ধু করছে মাঠ। ঠিক চাষবাসের জমি না। কিছুটা উঁচুনীচু ও মধ্যে মধ্যে পাথরের চাঁই ছড়ানো প্রান্তর, যদিও মাঠের রং মোটের ওপর সবুজ। ডানদিকে বেশ কিছু দূরে একটি বা দুটি গ্রামের

অল্প আভাস নজরে আসে, তাও স্টেশন থেকে মাইল তিনেক তফাৎ। আর বাঁ দিকে, চোখের দৃষ্টি বাধা পায় এমন কিছুই নেই, মাঠের পর মাঠ চলতে চলতে অবশেষে ধূসর রঙে শেষ হয়েছে। ধুলোয় ভরা প্রান্তর। দমকা হাওয়ার দাপটে ধুলো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে কখনো কখনো। রোদের আঁচ বেশ নরম। বসতি এদিকটায় কম বলে লোকজনের যাতায়াতও কম। দুটি-চারটি দেহাতী নারীপুরুষ কিংবা দু'তিনজন রাখাল ছাড়া পুরো ক্যানভাসটি একঘেয়ে। 'বেলা' স্টেশন একেবারে ফাঁকা, পরের গাড়ির অনেক দেরি।

সতীশচন্দ্র ভাবছিলেন, আবহাওয়া এরকম ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে রওনা দিতে পারলে কি ভালোই না হতো, কিন্তু—

শুঁটকো সেই বুদ্ধিমান লোকটি যদিও সঠিক বলতে পারেনি কোন গ্রাম থেকে পালকি আসছে, কিন্তু তার আন্দাজ ঐ গ্রামের নাম 'কুটুম্বা'। তাই আনুমানিক ভাবে সে প্রান্তরের একটা দিক দেখিয়ে বলে গিয়েছিল, হুজুর পালকি আসবে ওই হোথা দিয়ে—

ওঁরা দুজন হাঁ করে সেদিকেই তাকিয়ে। কোথায় কি! পালকির চেহারা দূরের কথা একটা ছায়াও তো চোখে পড়ে না। আটটা বাজলো। অতক্ষণ একদৃষ্টে দেখার ফলে দুজনের চোখ করকর করছে।

সতীশচন্দ্র আর থাকতে না পেরে বললেন, এ কি কাণ্ড মশাই? পালকি আর আসবে কখন? দারুণ গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। পালকি আদৌ আসবে তো? চারুবাবুরা হাতিতে 'বরাবর' পাহাড় রওনা দিলেন, আর রবিবাবু পড়ে রইলেন এখানে?

'ক'বাবু খুব চিন্তিতভাবে বলেন, তাই তো! বুঝতে পারছি না কিছু। বরং চলো সতীশ, আমরা একটু এগিয়ে দেখে আসি।

মাঠের মধ্য দিয়ে দুজনে অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন। এবং ফিরে এলেন। কিছু লাভ ছিল না অবশ্য।

পৌনে ন'টা। দুজনে খুব অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন এধার ওধার। পাগড়িধারী পেয়াদা দুজন ক্যাবলার মতো ওঁদের পিছু পিছু একবার এদিক আরেকবার ওদিক যাচ্ছে।

সতীশচন্দ্র লজ্জিত, বিরক্ত। রবিবাবুকে মাঠের মাঝে ওয়েটিং রুম নামক নিছক একটি টিনের চালাঘরে বসিয়ে রেখে এ কি ধরনের রসিকতা! সব সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছে, সব আমার হাতের মুঠোয়, জানিয়ে ওঁকে 'বরাবর' পাহাড় নিয়ে যাবার বাহাদুরি দেখানোর 'ক'বাবুর কি প্রয়োজন ছিল? রবিবাবু এতক্ষণ একলা বসে বসে কি ভাবছেন ওঁদের সম্বন্ধে?

ন'টা দশ। একজন পেয়াদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, বাবু, ঐ দেখুন—

শুঁটকো লোকটির অনুমান ভুল। সে যেদিকের কথা বলে গিয়েছিল তার ঠিক উলটো দিকে দূরে কালো মতো কি দেখা যায়। জিনিসটা নড়ছে, জিনিসটা চলছে, জিনিসটা এদিকেই আসছে। ছবি দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছে প্রতি মিনিটে। কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল, পালকি। আধ ঘণ্টা পরে দুটি পালকি ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ছ'জন করে মোট বারোজন পালকিবাহক রয়েছে।

'ক'বাবু ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঠিক বাঘের মতো লাফিয়ে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিতে লাগলেন। তাঁর ভাষার দাপটে বারো-জন জোয়ান কাঁচুমাচু মুখ করে চুপ।

অত দেরি হলো কেন? তোমাদের না সকাল ছ'টায় এখানে হাজিরা দেওয়ার কথা? কাল সন্ধ্যেতে খবর পেয়েও চুপচাপ ঘরে বসে রইলে, এতোই তোমরা নবাব?

হুজুর, আমাদের কি দোষ? আমরা তো খবর পেয়েছি আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে।

অ্যাঃ, আজ সকালে খবর পেয়েছো? সত্যি কথা?

হ্যাঁ হুজুর। সত্যি। আজ সকালে। খবর পেয়ে আমরা আর দেরি করিনি। পালকি দুটো একটু ঝেড়েমুছে নিয়ে সবাই ভাত খেতে বসে গেলাম। ভাত খেয়ে আসছি।

ভাত খেয়ে এলে? কখন?

এই একটু আগে হুজুর।

কেন ভাত খেয়ে এলে ? তোমাদের না 'বরাবর' পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে তারপর খাওয়ার কথা ? তোমাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি ? এখন ভাত না খেয়ে এলে নিশ্চয় আরো খানিকটা সময় বাঁচতো—

হুজুর অনেকটা পথ। তাই সবাই পেট ভরে ভাত খেয়ে এলাম। ওখানে যেতে যেতে সব হজম হয়ে যাবে হুজুর। তখন আবার খাবো।

তোমাদের তিনটে পালকি আনার কথা ছিল, দুটো কেন আনলে ?

হুজুর, আমাদের গ্রামে চারটে পালকি আছে। তার মধ্যে দুটো পালকি অন্য জায়গায় ভাড়া খাটতে গেছে গত পরশু। ফিরবে আজ রাত্তিরে। তাই যে দুটো পালকি ছিল, সে দুটোই নিয়ে এলাম।

উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরে অধৈর্য সতীশচন্দ্র বললেন, যাক গে, আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। ছেড়ে দিন। পালকি এসেছে এই ঢের। চলুন, রবিবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।

হ্যাঁ, মন্দ বলনি কথাটা। বাজে সময় নষ্ট করে কি হবে ? চল।

যেতে যেতে হঠাৎ সতীশচন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, আচ্ছা 'ক'বাবু, পালকি তো দুটো আর আমরা তিনজন, যাব কি করে ?

পালকিতে তিনজন যাবে তোমায় কে বললো ? দুজন। রবিবাবু আর তুমি। তুমিই রবিবাবুকে নিয়ে যাবে। অবশ্য তোমাদের পালকির পাশেপাশে পেয়াদা দুজনও যাবে।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত সতীশচন্দ্রের কয়েক সেকেণ্ড বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর অবস্থাটা একটু সামলে বললেন, আমি নিয়ে যাব কি রকম ? বলেন কি আপনি ! ওরা সব আপনার চেনা, আপনারই লোক। 'বরাবর' পাহাড়ে নীচে যারা তাঁবু খাটিয়ে রান্নাবান্না করছে তারাও কেউ আমাকে চেনে না, আমার মতো উটকো লোকের কথা মানবে কেন ? তা ছাড়া 'বরাবর' পাহাড়ে এর আগে আমি কোনো দিন যাইনি। তিনটে পাহাড়ের মধ্যে কোনদিকে গুহা, আমি কিছুই জানি না। আমি রবিবাবুকে কি সাহসে নিয়ে যাবো ? পুরো অ্যারেঞ্জমেণ্টটা আপনার, সব লোকজন আপনার, আপনি না গেলে চলবে কি করে ?

কে বললো আমি যাচ্ছি না ? পালকিতে যাচ্ছি না, শুধু এটুকুই

তো বললাম।

তবে কিসে যাচ্ছেন?

আমি টমটম (ঘোড়ার গাড়ি) করে যাবো।

টমটম এদিকে আপনি পাবেন কোথায়?

যেখান থেকে পালকি এলো, সেখান থেকেই পাবো। সে বিষয়ে তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না আমি এখুনি লোক ছুটিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে টমটম এসে যাবে।

কিন্তু 'ক'বাবু, আপনি—

আরে কিচ্ছু কিন্তু নেই। তুমি নিশ্চিন্তে রবিবাবুকে নিয়ে রওনা হও। তোমরা 'বরাবর' পাহাড়ের নীচে গিয়ে দেখবে তোমাদের আগেই তাঁবুতে পৌঁছে আমি পুরনো হয়ে গেছি।

'ওঁরা ওয়েটিং রুমে গিয়ে দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ কি যেন ভাবছিলেন অন্যমনস্কে। দুজনের পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। টেবিলে খাতাটি খোলা, তার মধ্যে পেনসিল রাখা। সতীশচন্দ্র তখনি বুঝলেন নতুন আরো কিছু লেখা শেষ হয়েছে।

নিজের মানসিক দুশ্চিন্তার কথা মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়ে সতীশচন্দ্র উদ্‌গ্রীব পায়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের খাতায় উঁকি দিলেন। আরেকটি দুর্ধর্ষ কবিতা জন্ম নিয়েছে।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে-জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।
পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,

পথিক চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।

দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে

তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

বিপদ-বাধা কিছুই ডরে না সে

রয় না.পড়ে কোনো লাভের আশে,

যাবার লাগি মন তারি উদাসে—

যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া,

পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।

'ক'বাবু বললেন, রবিবাবু, এবার চলুন। পালকি রেডি।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলেন, যাব? কিন্তু এখন ক'টা বাজে?

আজ্ঞে দশটা বাজতে মিনিট তিনেক বাকি।

রবীন্দ্রনাথ ইতস্তত করে বললেন, বড্ড দেরি হয়ে গেল না? এখন রওনা হওয়াটা কি উচিত হবে? ঠিক সময়ে ফিরতে পারবো?

কেন পারবেন না? পাহাড় দেখার সময়টা একটু সংক্ষেপ করতে হবে, এই যা। দশটায় রওনা দিলেন। পৌঁছোতে বারোটা। আড়াই ঘণ্টা পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর চান খাওয়া বিশ্রাম মিলিয়ে ধরুন দেড় ঘণ্টা। চারটেয় সেখান থেকে রওনা দিতে কোনো অসুবিধে নেই। তাহলে সন্ধ্যে ছটায় 'বেলা' স্টেশনে পৌঁছবেন। গয়ায় ফেরার গাড়ি তো আরো আধ ঘণ্টা পরে। রবিবাবু, অনিচ্ছাকৃত এই দেরির জন্যে আমি খুব লজ্জিত। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।

না, না মনে করার কি আছে? চলুন তবে।

পালকিতে উঠে রবীন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত ভাবেই 'ক'বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?

আজ্ঞে আমি টমটমে যাবো। রবিবাবু, আপনি গরম জলে চান করেন? আমি তো অনেক আগে গিয়েই ওখানে পৌঁছবো, আপনার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা রাখবো কি?

না, না। আমি সব সময়েই ঠাণ্ডা জলে চান করি।

আচ্ছা। তাহলে ঝরনার চমৎকার ঠাণ্ডা জল পাঁচ-ছ' কলসী

আপনার চানের জন্য ভরে রেখে দেবো'খন।

পালকি রওনা হল। রবীন্দ্রনাথের পালকি আগে আর সতীশচন্দ্রের পালকি খানিকটা পিছনে। দুজন পেয়াদা পায়ে হেঁটে পালকির সঙ্গে সঙ্গে চললো। সতীশচন্দ্র যেতে যেতে পালকির দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেন, 'ক'বাবু সহাস্যে হাত নাড়ছেন। সতীশচন্দ্র মনে মনে স্বীকার করেন, হামবড়াই ভাব দেখালেও লোকটা আসলে মন্দ না।

পালকি এগিয়ে চললো। বেলা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে গরম। চতুর্দিকে খালি মাঠ আর মাঠ। শুকনো নদীখাত, কোথাও বা ক্ষীণ নদী-স্রোতের আভাস, মাঠের মধ্যে পাথুরে ভাব বাড়ছে। বাড়ছে ধুলোর ঝাপটা। বেশ খানিকটা পথ অন্তর অন্তর পালকিবাহকেরা পালকি নামিয়ে রাখে কোনো গাছতলায় বা ক্বচিৎ কোনো ইঁদারার পাশে। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে, জল খেয়ে আবার যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ এবং তিনিও ঐ সময়টুকুর জন্য পালকি থেকে নেমে হাঁটা-চলা করে নিচ্ছেন।

পালকির কিন্তু চলার শেষ নেই। গরম ও ধুলোয় অতিষ্ঠ সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, আর কদ্দূর?

একই উত্তর, আরো খানিকটা সামনে বাকি।

দুপুর বারোটা বাজলো। তবে যে 'ক'বাবু বলেছিলেন, বড়জোর দু'ঘণ্টার পথ? দু'ঘণ্টা তো হয়ে গেল! আরো প্রশ্ন মনে জাগছে, এত-ক্ষণে 'ক'বাবুর ঘোড়ায় টানা টমটম পালকির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু কই? 'ক'বাবু গেলেন কোথায়? তাহলে বোধ হয়, ঘোড়ার গাড়ি চলবার পথ আলাদা।

পৌনে একটা। সতীশচন্দ্রের দারুন খিদে পেয়েছে। খিদে পাওয়াই স্বাভাবিক। 'লাস্ট' খেয়েছিলেন গতকাল রাত্তির আটটায়। আর আজ সকালে দু'ভাঁড় চা। তিনি মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, 'বরাবর' পাহাড়ের তলায় তাঁবুতে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়েই সোজা খেতে বসে যাবেন। পাহাড় দেখা মাথায় থাকুক, তিনি কিছু না খেয়ে পাহাড়ে উঠতে পারবেন না।

রান্না তো অনেক রকম হবে, দুজন রাঁধুনে, তিনজন যোগানদার। এখুনি তাহলে ঠিক করে রাখা উচিত, কি কি খাবেন। খেতে বসে তবে আর কোনো চিন্তা থাকে না। তিনি ভাবতে লাগলেন, নির্ঘাত আজ পোলাও। কিসমিস, কাজুবাদাম আর খুব বেশি ঘি দেওয়া ফাইন চালের সুগন্ধী পোলাও। কিন্তু এমন গরমের মধ্যে পোলাও খেতে ভালো লাগবে কি? এবং তা ঠিকমতো হজম হবে কি? তার চেয়ে সাদা ভাত আর ডাল মিললেই তিনি বেশি খুশি হন। পোলাও ছাড়া ভাত আর ডাল রান্না হয়েছে নির্ঘাত। তার সঙ্গে যে কোনো একটা ভাজা। গেরস্থ বাঙালীর ছেলের পক্ষে ভাত ডাল ভাজাই ঠিক। আর হ্যাঁ, দই, পাড়া-গাঁয়ের এদিকটায় টক দইয়ের খুব সুনাম। সাদা জমাট দই, খেতে চমৎকার, দামেও খুব সস্তা। ওই গরমে ঠাণ্ডা দই বেশি করে খাওয়া শরীরের পক্ষে খুব ভালো। দশ-বারো হাঁড়ি দই নিশ্চয়ই আসবে, এক হাঁড়ি তিনি নেবেন। একটু চাটনিও নেওয়া যায়, মুখটার স্বাদ বদলাবে। ব্যস্ আর কিছু না। দুপুর সোয়া একটা। আর কদ্দূর? সতীশচন্দ্র ঘড়ি দেখা বন্ধ করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যতক্ষণে পৌঁছয় পৌঁছোক। এক সময়ে কি থামবে না? রোববার সন্ধ্যেতে প্রভাতবাবুর মুখে শুনেছিলেন, 'ক'বাবু ইতিপূর্বে পনেরোবার 'বরাবর' পাহাড় ঘুরে এসেছেন। কথাটা নিশ্চয় মিথ্যে। পৌঁছবার সময় সম্বন্ধে যখন ওঁর অতটা ভুল ধারণা, তখন উনি হয়তো আদৌ একবারও আসেননি। রবিবাবুর কাছে ঘড়ি নেই। সেইটেই বাঁচোয়া, সম্ভবত এ দেরিটা উনি টের পাচ্ছেন না।

একটা পঁচিশ, ঠিক এই সময়ে একটি অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে সতীশচন্দ্র আরো দরদরিয়ে ঘামতে লাগলেন। যে মেঠো পথ দিয়ে ওঁদের পালকি যাচ্ছিলো, ডান দিক দিয়ে আরেক মেঠো পথ ওঁদের পথে মিশেছে। দুটো রাস্তার মোড়ে পালকিটা বাঁক ঘুরতে যাবে, একটা গরুর গাড়ি হ্যাঁকোচ হোঁকচ করতে করতে পথের ধারে সরে গিয়ে পালকি যাওয়ার পাশ করে দিল। পালকির দরজা দিয়ে তিনি উঁকি মেরে দেখলেন, গরুর গাড়িটায় স্তূপাকার তাঁবু, বাঁশ, কাছি দড়ি, মাটিতে গাঁথবার হুক। মানে, সোজা কথায়, তাঁবু এবং তাঁবু গাঁথবার লটবহর

নিয়ে গরুর গাড়িটা তাঁদের পথের দিকেই যাচ্ছে। অতি নিশ্চিত সত্য— এ তাঁবু তাঁদের জন্যেই! সর্বনাশ! এখনো তাঁদের তাঁবু রাস্তায়, গরুর গাড়িতে? তা হলে গতরাত্রে তাঁবু খাটিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়নি? তাঁবুর ব্যাপারে 'ক'বাবুর ঢালাও বর্ণনা পুরোপুরি ফাঁকি? তা হলে, এই ভর-দুপুরে কড়া রোদে তাঁদের গাছতলায় বসেই খেতে হবে। অদেখা দুই মহারাজ (রাঁধুনে ব্রাহ্মণ) ও তিনজন যোগানদারকে সতীশচন্দ্র মনে মনে খুব বাহবা দিলেন যে, বেচারারা তাঁবু না পেয়েও রোদ্দুরে বসে বসে সকলের জন্য খাবার বানিয়েছে। আশা করা যায়, তারা তিন-চারটে গাছের তলা এমনভাবে বেছে নিয়েছে যাতে রোদ্দুরের ভোগান্তি যথা-সম্ভব কমই। কিন্তু 'ক'বাবুর এ কি ব্যবহার? কেমন ব্যবস্থা হলো সে সম্বন্ধে তিনি কোনো খোঁজখবর না নিয়ে হুট করে সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন এখানে? বিশেষত রবিবাবুকে! ওঁর মতো লোক ভরদুপুরে গাছ-তলায় পাতা পেতে খাবেন ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

একটা চল্লিশ। অবশেষে পালকি থামলো বরাবর পাহাড়ের নিচে। সতীশ তাড়াতাড়ি নামলেন, রবিবাবু কি করছেন দেখতে। এবং 'ক'বাবু এসেছেন কিনা জানতে!

কোথায় 'ক'বাবু আর কোথায় তাঁর টমটম! সব ভোঁভাঁ, রবীন্দ্রনাথ একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর চুপ করে বসে আছেন। মুখের ভাব শান্ত। চারুবাবু, অসিতবাবু, ত্রিগুণাবাবুর অবস্থা শোচনীয়। দারুণ বিমর্ষ মুখে তাঁরা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে। রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি। কিন্তু চারুবাবুদের মুখে অতো হতাশ বিমর্ষ কেন? হাত মুখ ধুয়ে দুটি খেয়ে নিলে চনমনে সতেজ ভাব নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, রবিবাবু, আপনি পৌঁছে-ছেন কতোক্ষণ?

দশ মিনিট হবে।

এখন কি পাহাড়ে উঠবেন?

পাহাড় দেখার আর সময় কোথা? আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। যেতেও তাই লাগবে। পালকিবেয়ারারা ঝরণার জলে হাত মুখ

ধুয়ে খানিক বিশ্রাম করে নিক। আধ ঘণ্টা পরে আমরা ফিরতি পথ ধরবো।

চারুবাবুদের হাতিটি পরম আনন্দে শুঁড়ে করে চতুর্দিকে জল ছেটাচ্ছিল।

সতীশচন্দ্র বললেন, তা হলে রবিবাবু, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন।

কথাটা শুনে রবীন্দ্রনাথের ঠোঁটে হাসির ঈষৎ আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। আর চারুবাবুরা ফোঁস করে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কি ব্যাপার রবিবাবু?

রবীন্দ্রনাথ খুব শান্ত কণ্ঠে বলেন, খাওয়ার কথা কি বলছেন, তার তো কোনো আয়োজন দেখতে পাইনে।

সে কি! তা হলে তুজন রাঁধুনে তিনজন যোগানদার কি করলো এতোক্ষণ বসে বসে?

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু হেসে জবাব দিলেন, আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

সতীশচন্দ্রের মাথাটা চন করে ঘুরে উঠলো। তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলেন, তা কেমন করে হবে? তারা অবশ্যই আছে। গতরাত্তির থেকেই আছে। কোনো পাথরের চাঁই কিংবা টিলার আড়ালে পড়েছে বোধ হয়। নাকি অন্য কোনো দিকটায় বসেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

রবীন্দ্রনাথ আর কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন।

সতীশচন্দ্র এধার ওধার বেশ কয়েক বার চিৎকার ডাকাডাকি করেন। পেয়াদা তুজনও বার কতক চক্কর দিয়ে এসে হতাশভাবে মাথা নাড়লো। সতীশচন্দ্র হতবাক, চারুবাবুদের ঘেঁষে চুপচাপ মাটিতে বসে রইলেন। এরকম কেলেঙ্কারি তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। এমন চূড়ান্ত অব্যবস্থাটা যেন আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না, কিন্তু বিশ্বাস না করলেই বা উপায় কি! লজ্জায় রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে এখন দারুণ মুশকিল। যদিও তিনি জানেন, তাঁর নিজের দোষ কিছু নেই, গোটা ব্যাপারটায়

তাঁর দায়দায়িত্ব ছিল না। এবং ওঁরাও তাঁকে দোষ দেননি। কিন্তু মুশকিল হলো, 'ক'বাবুও গয়ার বাসিন্দা, তিনিও গয়ার বাসিন্দা, কোথায় যেন অদৃশ্য দায়িত্বের কাঁটা তীক্ষ্ণভাবে হৃদয়ে বিঁধছে।

চারুবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা তো এখানে অনেকক্ষণ এসে গেছেন?

হ্যাঁ অনেকক্ষণ, আমরা পৌঁছেছি এগারটায়।

কি করলেন এতোক্ষণ?

কি আর করবো, প্রথমটায় আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম যাদের আসার কথা ছিল, তারা কেউ এসেছে কি না। যখন বুঝলাম কেউ আসেনি, তখন বসে বসে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, কতক্ষণে আসেন।

আপনারা পাহাড়ে উঠে গুহা দেখতে গিয়েছিলেন নাকি?

না। রবিবাবু পৌঁছোননি, আর আমরা উঠে গেলাম তা কি হয়? তা ছাড়া প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলাম, আপনারা এই বুঝি এলেন, এসে যদি আমাদের দেখতে না পান, তাই—

ইতিমধ্যে হ্যাঁকোচ হোঁকচ করতে করতে তাঁবু বোঝাই গরুর গাড়িটা এসে গেছে। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে তাঁবু নামাবার উদ্যোগ করতে যেতেই সতীশচন্দ্র চোখ রাঙিয়ে বলেন, থাক, তোমায় আর নামাতে হবে না। অনেক হয়েছে! তাঁবু নিয়ে আসতে এতো দেরি কেন?

গাড়োয়ান বেচারির জবাব ঠিক পালকিওয়ালাদের মতো। সে বললে, আমি তাঁবু পৌঁছে দেয়ার হুকুম পেয়েছি আজ সকালে। খবর পেয়েই ছুটি খেয়ে ঘণ্টা দুই হলো রওনা দিয়েছি। হুজুর, আমার কি দোষ বলুন?

যারা খাবারদাবার আনবে, যারা রান্না করবে, তারা কোথায়?

আজ্ঞে হুজুর, তা তো জানি না।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দূরে হইচই এক হল্লা! আবার কি গোলমাল জানতে চারুবাবুরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে উঠলেন। দেখা গেল ছ'জন লোক গলদঘর্ম অবস্থায় ফুল স্পীডে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে।

প্রত্যেকেরই মাথায় পিঠে হাতে ভারী বোঝা। কাছে এসে লোকগুলি তাদের বোঝা এক এক করে মাটিতে নামিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে লাগলে।

সেলাম করে তারা বললো, হুজুর, ঠিক সময়ে এসে গেছি।

কয়লার বস্তা, চালের বস্তা, ডালের বস্তা, ঘিয়ের নাগড়ি, বড়ো দুটো ঝুড়ি ভরতি নানান সবজি—অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

তোমাদের এতো দেরি হলো কেন?

সে কি হুজুর, দেরি তো একদম হয়নি! আমরা তো খবর পেলাম আজ সকাল দশটায়। জিনিসপত্র যোগাড় করে, নিজেরা অল্পস্বল্প দুটি খেয়ে আসতে এরকম সময়ই লাগবে হুজুর। সকাল এগারটায় সময় আমরা জিনিসপত্র কেনাকাটি করছিলাম। সেখান থেকে এখানে আসতেও তো এক ঘণ্টার পথ।

যদিও জিজ্ঞেস করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, তবুও সতীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, রাঁধুনে মহারাজরা কোথায়?

আজ্ঞে তারা আসছে, এক ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে। সঙ্গে তারা মশলাপাতি, পেস্তা, কিসমিস, আচার, পাঁপড়, বাসনপত্র নিয়ে আসছে।

এদের মধ্যে দুজন লোক আবার পরম আপ্যায়িতের হাসি হেসে বললো, হুজুর চিন্তা করবেন না। এখুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা আসল জিনিস নিয়ে এসেছি।

আসল জিনিস!

হ্যাঁ, এই যে খন্তা—

লোক দুজন এক হাত লম্বা দুটি লোহার খন্তা বার করে ওঁর নাকের সামনে ধরলো।

খুব ভালো খন্তা হুজুর, আসল কাজের জিনিস। কিছুক্ষণের মধ্যেই খন্তা দিয়ে আমরা দুটো উনুন খুঁড়ে ফেলবো। তারপর কয়লার আঁচ জ্বালিয়ে দিতে আর কতোক্ষণ! ব্যস, এর পর মহারাজরাও এসে যাবে। দুটো খন্তা সঙ্গে থাকলে আর ভাবনা কি হুজুর? বড় জোর তিন ঘণ্টা, না হয় চার ঘণ্টাই লাগুক, তারি ফাঁকে রান্না শেষ।

এ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র চুপচাপ ছিলেন। মাথা গরম হতে দেননি। কিন্তু খন্তার আবির্ভাবে এবং তার অঢেল গুণ বর্ণনায় তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। রাগে আগুন হয়ে লোকগুলিকে যা মুখে আসে তাই বকাবকি করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় চারুবাবুকে দিয়ে ওঁকে কাছে ডাকেন। বললেন, ও-বেচারাদের গালিমন্দ করে কি লাভ? ওদের তো কোনো দোষ নেই, দেখছেন না ওদের কি রকম কাঁচুমাচু মুখ, ওরা বুঝতেই পারছে না গোলমালটা কোথায়। পালকিওয়ালা থেকে শুরু করে কেউই দেখছি ঠিক সময়ে খবর পায়নি।

কয়েক মিনিটের জন্য সবাই চুপ।

রবীন্দ্রনাথ আবার বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে কেউ অযথা মন ভারাক্রান্ত করবেন না এই আমার অনুরোধ। চলুন, সতীশবাবু এবার আমাদের ফেরার পালা। আপনি পালকি বেয়ারাদের ডেকে আনুন।

সতীশচন্দ্র একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন তাদের। তারা কোথায়? পাত্তা নেই, সাড়াশব্দও নেই। ডেকে ডেকে তাঁর গলা ভেঙ্গে যাবার যোগাড়। খুঁজতে খুঁজতে শেষে বার করেন, ঝরনার ধারে, তারা বেশ চানটান করে নিয়ে বসে গল্প করছে।

তোমরা এবার চলো।

তারা তো অবাক! সে কি হুজুর? এখুনি? এখুনি যাবো কেন? ভাত রান্না হোক, আমরা ভাত খেয়ে তারপর যাবো।

যারা পাশের গ্রাম থেকে কাঁচা খাবারদাবার ঝুড়িতে বস্তায় এনেছিল, তাদের মধ্যের একজন দিব্যি এ দলে জমে গেছে। সে উৎসাহিত কণ্ঠে রান্নার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাচ্ছিলো, সতীশচন্দ্র থামিয়ে দিলেন।

আর ভাত খেতে হবে না, বাবারা। ভাত খেতে বসলে আজকের রাত এখানেই শুয়ে থাকতে হবে। সন্ধ্যে সাড়ে ছটার পর গয়ায় ফেরার আর ট্রেন নেই। চলো বাবারা, ওঠ।

হুজুর, তাঁবু তো এসেই গেছে, তা হলে আজ রাত এখানে থেকে যান না।

থাকার উপায় নেই বাবারা। তোমরা পালকি করে যে আরেকজনকে নিয়ে এলে, তিনি আজ রাতের গাড়িতে অনেক দূর চলে যাবেন। টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

মিষ্টি কথায় সবাই বশ। গাঁইগুঁই করলেও পালকিবাহকেরা ফিরে যায় পালকির কাছে। এবার এঁরা পাঁচ জন বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে পা ফেলে ফেলে ঝরনার ধারে এলেন। হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিলেন আকণ্ঠ।

'ক'বাবুর দেওয়া অন্তত এই একটি তথ্য নির্ভুল। ভারি সুন্দর ছোট্ট ঝরনাটি। জলও চমৎকার।

ওঁরা যেখানটায় উঠেছেন তা মাটি থেকে প্রায় পঁচাত্তর ফুট ওপরে। পজিশনটা অসাধারণ। ওঁদের ডান পাশে কয়েক ফুট দূরে ঝরনার শুভ্র ফেনা-ভরা জল ঝাপটা মারতে মারতে নামছে নিচে।

তারপর একটা বিরাট পাথরের টুকরো খানিকটা যেন ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুঁকেছে। এবং তার সামনে একেবারে ফাঁকা। অতো উঁচু থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একেবারে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতি। দূরে দূরে কয়েকটি গ্রাম। ধোঁয়া ওড়ে। আশেপাশে বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই। সামনের পাথর ছড়ানো মাঠে পালকিবাহকেরা যারা চাল ডাল নিয়ে এসেছিল, গরুর গাড়ি এবং একটি হাতি—ছবির ফ্রেমের মধ্যে আঁটা যেন এক স্থির চিত্র। তা ছাড়া কেউ নেই। গরু ছাগল চরানো রাখাল-ও না।

এবার ওঁরা 'বরাবর' পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। মাঝারি পাহাড়। খাড়াই উঠে যায়নি। ছড়িয়ে রয়েছে অনেকটা, মধ্যে মধ্যে পাথরের ফাঁকে সবুজ ঘাস, বন্য লতা। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট একটুখানি পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ওপর দিকে। দুটো বাঁকের পর আর দেখা যায় না। গুহাগুলোতে পৌঁছোবার সম্ভবত ওটাই রাস্তা। ওঁদের কাছাকাছি গোলাকৃতি এক বড়ো পাথরের টুকরোয় কতোগুলো

সাদা রঙের পাখি ঝাঁক বেঁধে কিচমিচ করছিল, চারুবাবু হাততালি দিতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তারা তখুনি উড়ে গেল। এবং একটু পরেই ফিরে এলো চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে।

ওঁরা দেখলেন, প্রখর সূর্যের আলো স্নান করিয়ে দিচ্ছে কালো পাথরে তৈরী 'বরাবর' পাহাড়কে। একদিকে ছায়া নামছে ধীরে ধীরে।

সব মিলিয়ে অপূর্ব পরিবেশ। অজানা বন্য ফুলের সৌরভ ছড়ানো চারদিকে। ওঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর আবার পাথরে পা ফেলে নিচে যাবার রাস্তা ধরলেন। সকলের মনে আফসোস, এতো দূর এসেও 'বরাবর' পাহাড়ে উঠে ঘুরে ঘুরে দেখা সম্ভব হলো না। কাঁচের মতো পালিশ দেয়াল দেওয়া গুহাগুলিও অদেখা রয়ে গেল। আর কোনোদিন কি এ পথে আসা হবে, দাঁড়াতে পারবেন কি শান্ত ঝরনাটির পাশে? এ পরিবেশ ফিরে পাবেন কি যখন ঝলমলে রোদ স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে কালো পাথরের পাহাড়ের একদিকে, আর হাত-তালির শব্দে যেখানে দলবেঁধে উড়ে যায় সাদা পায়রার দল এবং আবার নির্ভয়ে একটু পরেই ফিরে আসে?

কে জানে!

অবশ্য তাঁরা, এক হিসেবে. পাহাড়টিকে "চূড়ান্ত" দেখা দেখলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ঝরনার ধার থেকে ঠিক ঠিক অ্যাঙ্গেলে পাহাড়ের তিনটে চূড়া পর্যন্ত খুব ভালো মতো দেখা যাচ্ছিলো।

আবার রওনা, চারুবাবুদের নিয়ে আগে চলছে হাতি, তারপর দুখানা পালকি। চাল ডাল সবজি ঘি ইত্যাদি কি হবে? সতীশচন্দ্রের ইচ্ছে, গ্রামের যে ছ'টি লোক ওগুলো নিয়ে এসেছে, তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ওঁর পালকির সঙ্গে সঙ্গে যে পেয়াদাটি এসেছিল, সে খুব চালাক। সে বার বার অনুরোধ করলো, বাবু, ওগুলো এখন ফেরত দেবেন না। খানিকটা হাতির পিঠে আর বাকি অংশ গরুর গাড়িতে ঠেসেঠুসে তুলে নেওয়া হোক, পরে হয়তো কাজে দেবে।

অগত্যা তাই নিতে হলো। আর পরে সত্যিই দেখা যায়, নেওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ। অনবরত গরম হাওয়ার ঝাপটা, আর প্রচুর ধুলো। ঝরাপাতা খড়কুটো সঙ্গে করে ধুলোর স্রোত পাক খেতে খেতে ওঠে নামে। ফেরার পথে পালকির স্পীড আরো জোরে। হল্টেজও করছে আসার তুলনায় কম। কিন্তু রাস্তা সত্যি অনেকটা।

খিদেতে সতীশচন্দ্রের পেট জ্বলছে। শুধু 'জ্বলছে' বললেও যেন ঠিকভাবে প্রকাশ করা মুশকিল। পালকির মধ্যে নড়াচড়ার জায়গা থাকে না। মাথাও একটু ঝুঁকিয়ে বসতে হয়। কিন্তু খিদের চোটে তিনি ঐটুকু জায়গার মধ্যেই এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। কিন্তু অতো খিদে পাচ্ছে কেন? গত রাত্তিরে যা খেয়েছেন, তারপর থেকে এখনো তো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি! খিদে না হয় পাক, কিন্তু অতো কেন? কতো লোকই তো একদিন কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় না খেয়ে থাকে। তাঁর নিজেরও, ইতিপূর্বে নানা কারণে, এক-দেড়দিন উপবাসের একাধিক অভিজ্ঞতা আছে। তবে? তিনি না হয় তেমনি আজও অন্য কিছু না খেয়ে, খাওয়ার চিন্তার বদলে অন্য রকম ভালো ভালো চিন্তা করে, শুধু জল খেয়েই রইলেন! তাতে অতো কি বায়নাক্কা?

জল খেয়ে পুরোদিন থাকার কথা ভাবতে ভাবতে এ প্রচণ্ড খিদের উৎপাতের আসল কারণ তিনি বুঝতে পেরে গেলেন। ছিঃ। 'বরাবর' পাহাড়ের ঝরনার জল আদেখলার মতো আকণ্ঠ খাওয়া উচিত হয়নি তাঁর। পাহাড়ী ঝরনার জল দারুণ ডাইজেসটিভ। এমনিতেই তখন ছিল তাঁর পেট খালি, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছিল, তার ওপর হজমী জল গিয়ে সেই খিদে ডবল বাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলায় এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের কাছেও শুনেছিলেন, পাহাড়ী এলাকায় ঘোরাফেরার পর সামলে-সুমলে ঝরনার জল খেও।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের কথাগুলির সত্যতা তিনি আজ, এ পালকির মধ্যে এপাশ ওপাশ করতে করতে, মর্মে মর্মে টের পেলেন। হায়! ঝরনার জল পেট ঠেসে খাওয়ার সময়ে ঐ কথাগুলো কেন মনে পড়েনি!

বিকেল চারটের সময় আধাআধি রাস্তা পার করে পালকিবাহকেরা থেমে মাঠের ওপর পালকি নামিয়ে রাখলো। নির্মেঘ নীল আকাশে

রোদের তেজ তখনো ঝকমকে কিন্তু ধুলোর প্রাবল্য অনেক কম। একদম পাশে একটি গ্রাম। কৌতূহলী কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে ভিড় বেঁধে দেখছে। পালকিবাহক বারোজন এসে দাঁড়ালো সতীশচন্দ্রের কাছে। বললো, হুজুর, আমরা আর পারছি না। খুব 'থকে' গেছি। আমাদের মদ খাওয়ার পয়সা দিন। মদ খেয়ে একটু জিরিয়ে আবার যাবো।

আর্জি শুনে উনি চমকে উঠেছেন। সর্বনাশ! মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এরা রবিবাবুর পালকি টানতে গিয়ে দারুণ অনর্থ ঘটাবে নাকি! নিজের পালকির পরিণামের কথা না হয় ছেড়েই দিলেন। সারাদিন ডামাডোল চলছে, এবার রবিবাবুব পালকি নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেলে কেলেঙ্কারির আর বাকি কিছু থাকবে না!

পালকিবাহকেরা ওঁর মনের আশঙ্কা টের পেয়েছে। গামছা দিয়ে নিজেদের ঘাম মুছতে মুছতে তারা পরম অভয়ের হাসি হেসে বলে, হুজুর কিছু ভাববেন না। পালকি চালাতে গিয়ে আমরা মাতাল হইনি কখনো। এসব আমাদের অনেক দিনের অভ্যেস। মদ খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিয়ে ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবো।

ভয় নেই? ভালো কথা, অবশ্য ভরসাও বিশেষ নেই।

সতীশচন্দ্র পকেট হাতড়ে দেখতে থাকেন মালকড়ি কতো আছে। বেশি নেই, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তিনি তো আর 'বরাবর' পাহাড় দেখতে যাবেন মনস্থ করে প্রস্তুত হয়ে গয়া স্টেশনে আসেননি। এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ট্রেনে তুলে দিতে। পকেট তাঁর তাই শূন্য থাকলেও বলার কি আছে? কিন্তু পকেট একেবারে শূন্য না, সেইটে রক্ষে! টাকা ও রেজগি গুনে দেখলেন, পুরোপুরি তিন টাকা। জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মদ খেতে লাগবে কতো?

তারা হিসেব করে জবাব দেয়, হুজুর, তবে দু' টাকা দিন, ওতেই হবে।

দু' টাকা এগিয়ে দেওয়া মাত্র ছোঁ মেরে নিয়ে তারা গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়লো। চেনা মদের দোকান সেখানে।

হাতে এক টাকা। পেয়াদা দুজনকে ডাকলেন। সে বেচারারাও

আগাগোড়া পালকির সঙ্গে লাঠি হাতে গার্ড দিতে দিতে হেঁটে এসেছে এবং যাচ্ছে। ওদের দুজনকে ছ' আনা করে দিয়ে বললেন তোমরাও গ্রামের ভেতরে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে নাও।

দু' আনা দিলেন গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে। হাতির মাহুতরা কিছুটা চিঁড়ে গুড় এনেছিলো দুজনের মতো। কাজেই ওদের ঝামেলা নেই।

বাকি রইলো সবেধন নীলমণি দু' আনা।

পেয়াদা দুজন পয়সা হাতে পেয়েই চলে যায়নি। দাঁড়িয়ে ছিল, বাবু নিজের জন্য কিছু আনতে দেন যদি।

সতীশচন্দ্র তাদের বলেন, বাবা, এই দু' আনা দিয়ে খানকতক লুচি কিনে আনতে পারবে ?

আজ্ঞে বাবু, লুচি ?

হ্যাঁ, লুচি।

বাবু, লুচি এ গ্রামে পাওয়া যাবে কি ? আচ্ছা দেখছি।

কিছুক্ষণ বাদে তারা ফিরে এলো, উনি পালকি থেকে নেমে উদ্‌গ্রীব ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের খালি হাতে দেখে খুব দমে গেলেন।

পাওনি ?

না বাবু, লুচি এখানে পাওয়া যায় না। তবে ভালো ছাতু পাওয়া যেতে পারে।

ছাতু ? তা হলে তাই আনো, একটু তাড়াতাড়ি এনো বাবারা।

পেয়াদারা ছাতু আনতে চলে গেলে সতীশচন্দ্র মাঠের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ছাতুর কথাই ভাবতে থাকেন। ইতিপূর্বে ছাতু কখনো খাননি। বলতে কি ছাতুকে বেশ অবজ্ঞাই করে এসেছেন এতকাল। আজ সেই অনাগত ছাতুর কথা যত ভাবতে লাগলেন, ততই ছাতুর প্রতি প্রেমে তাঁর মন উথলে উঠলো। ছাতুর যথার্থ মর্যাদা না দিয়ে তিনি এযাবৎকাল যথেষ্ট অন্যায় করেছেন নিঃসন্দেহে। উৎকৃষ্ট যব ভালো ভাবে গুঁড়ো করে এবং ভেজে তবেই তো ছাতু তৈরী। যথার্থ উপকারী হিতকারী বলদায়ক প্রকৃতিজাত খাবার, ভেজালের 'ভ' নেই।

ভিটামিনে ভরতি। তুলনায় লুচিতে আছেটা কি? ময়দায় তো কোনো উপকার নেই, আর ঘিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ছাতুর গন্ধ কি সুন্দর! শুনেছেন, জল ও নুন দিয়ে মেখে ঝাল কাঁচা লঙ্কা সহযোগে একেবারে অমৃত। কিন্তু এখনো ছাতু আসে না কেন? কখন আসবে? কখন তার সুন্দর রূপ তিনি নিজের চোখে দেখতে পাবেন?

অবশেষে গ্রামের মধ্য থেকে পেয়াদাদের ফিরতে দেখা গেল। একজনের হাতে রীতিমতো বড় একটি ঠোঙা। দু আনার জিনিসের অত বড় ঠোঙা কেন? উনি মনে মনে বুঝলেন—শহুরে কায়দা, ঠোঙা খুব বড় কিন্তু আসলে ভেতরে মাল খুব কম।

কিন্তু পেয়াদার হাত থেকে ঠোঙা নিয়ে খুলে তিনি বেশ চমকে যান। দু আনায় যে অতো ছাতু পাওয়া যেতে পারে, তা তাঁর ধারণার বাইরে। আগে জানলে দু পয়সার আনতে দিতেন।

বড় ঠোঙা পেয়াদার হাতে রেখে তার থেকে সন্তর্পণে খানিকটা অন্য এক শালপাতায় ঢাললেন। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কাও ছিল। লোটা থেকে একটু জল ঢেলে নুন মেখে একটি বড় ডেলা মুখে দিয়েই—

গলা দিয়ে নামছে না কেন? বুঝলেন অনভ্যাসের ফল। কিন্তু তিনিও ছোড়নেওলা নন। ঢক ঢক করে গলায় জল ঢেলে তলিয়ে দিলেন। এবার আরেক ডেলা, তারপর আরেক ডেলা, এবং শেষে আরেক ডেলা, কুল্লে চার ডেলা ব্যস ঐ পর্যন্ত! বুঝলেন এর বেশি খাওয়া তাঁকে দিয়ে আর হবে না। ঠেসে আরেক ডেলা ঢোকাতে গেলে বিপত্তির সমূহ সম্ভাবনা। যা খেয়েছেন, সেটাই হজম হলে হয়! গা ঘোলাচ্ছে। তার ওপর দারুণ ঝাল লঙ্কা খেয়ে ঝালের চোটে হ্যা হ্যা করতে লাগলেন। কলেজে যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেন, তখন অধ্যাপকের কাছে একদিন শুনেছিলেন, ভালোবাসার বিবাহপূর্ব কোর্টশিপ এবং পরে বিবাহের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। আজ ছাতু উপলক্ষে আপ্ত বাক্যটির সত্যতা মালুম পেলেন। ছাতু যখন আসেনি, আসি-আসি করছিল, তখন তার রূপ রস স্বাদ গন্ধ নিয়ে মনে ভাবের তরঙ্গ টলমল করছিল, চার গ্রাস খাওয়ার পরই সে ভাব এখন—

পালকিবাহকেরা তখনো ফেরেনি। সতীশচন্দ্র ভাবলেন এই ফাঁকে দেখে আসি রবিবাবুর এখন কি অবস্থা। কতখানি কাবু এবং করছেনই বা কি!

আগেই বলেছি, 'বরাবর' পাহাড় যাত্রার বিভ্রাট সম্বন্ধে উনি বিন্দু-মাত্র দায়ী না হলেও মনে মনে কিন্তু তিনি নিজেকে খানিকটা দায়ী করেছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, কথা বলবেন, ভাবলেই এমন সঙ্কোচ ও লজ্জা লাগছিল যে বলবার নয়। কিন্তু এও ভাবলেন, এই ভ্রমণ পূর্বে তিনি আগাগোড়া উপস্থিত থেকেও রবীন্দ্র-নাথের সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখায় বিন্দুমাত্র কর্তব্য পালন করতে পারেননি। এখন শুধু কাছে গিয়ে একটু খোঁজ নেওয়া, তাও পারবেন না?

জোর করে মন থেকে লজ্জা ও সংকোচের ভাব দূর করে তিনি এগোলেন। রবীন্দ্রনাথের পালকি, আন্দাজ আড়াই শো গজ তফাতে একটি গাছের তলায় রাখা।

তিনি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, কি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে দেখবেন? ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, ক্লান্ত, বিমর্ষ? দেখামাত্র অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে অনুযোগ শুরু করবেন? খুব স্বাভাবিক। সারাদিনের এমন ডামাডোল, যে জন্য সাধ করে আসা, তাও বিফল হয়েছে। খাবার পর্যন্ত জোটেনি। এবং সেই ঝরনার হজমী জল রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট খেয়েছেন তা নিজের চোখে দেখা। কাজেই খিদেতেও যে যথেষ্ট কাবু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যেতে যেতে আরেকটা কথাও ওঁর মনে পড়লো। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর নিজের হৃদয় গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ, কিন্তু অনেক এ ওর তার মুখে কত রকম উলটোপালটা মন্তব্য শুনেছেন বই কি—রবিবাবু? ধুর, উনি তো ফুলের গন্ধ শুঁকেই দিন কাটান, বাস্তব জগতের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক? বড়লোকের ছেলে, হাতে অঢেল সময়, শুয়ে শুয়ে খুব আরামে লেখেন। এরকম সুযোগ যদি আমাদের থাকতো, আমরা ওঁর চেয়ে ঢের ভালো লিখতাম, অন্তত ওঁর চেয়ে খারাপ লিখতাম না জেনে রেখো। সংসারের

চিন্তা যাঁর নেই, পান থেকে চুনও যাঁর খসে না, অসুবিধে, কষ্ট দুঃখ, এ সব শব্দ পর্যন্ত যাঁর অজানা, সুন্দর সুন্দর যুবতীরা যাঁকে সেবা করছে সব সময়ে, তিনি আরামে গদিতে হেলান দিয়ে লিখবেন, এতে আর বাহাদুরি কি? পারবেন তিনি অমুকবাবুর মতো লিখতে? আরে, দুঃখ কষ্ট বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া দূরে থাক, সামান্য অসুবিধেয় উনি একেবারে নেতিয়ে পড়েন। ধুর, অমন কবি ঢের দেখেছি—

সতীশচন্দ্র এবার দেখলেন, ভালো করে দেখলেন। পালকির দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। দেখবার অসুবিধে কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাব অতি প্রশান্ত। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ খাতায়। খস খস করে পেনসিল চলছে!

কবিতা লিখছেন! এই সময়ে এবং এই ঝামেলার মধ্যেও! সতীশ-চন্দ্রের মুখের হাঁ বন্ধ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথের পেনসিল থামলো। আসলে সতীশচন্দ্র যখন পালকির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ঐ কবিতার শেষ দু লাইন লিখছিলেন। ঝটপট লাইন দুটি লিখে হাতের খাতা পেনসিল নামিয়ে ফিরে তাকান সতীশচন্দ্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথ হাসছেন। স্নেহে কোমল অনিন্দ্যসুন্দর হাসি।

ওঁর দুধে-আলতা রং রোদের আঁচে আরো খানিকটা রক্তাভ। সারা শরীর ঘর্মাক্ত, গরদের ধুতি এবং পিরহান গায়ের সঙ্গে ভিজে সেঁটে গেছে। আশ্চর্য রূপবান, অলৌকিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটির দিকে, তাঁর হাসিমাখা অধরপ্রান্তের দিকে সতীশচন্দ্র সবিস্ময়ে এবং অপলকে তাকিয়ে রইলেন। বিরাট পুরুষটির অভ্রভেদী মহিমার সামনে কোনো রকম মালিন্য যে টিকতে পারে না, এ সত্যটি তিনি নতুন করে আবার উপলব্ধি করতে পারলেন এক নগণ্য গ্রামের নিরালা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ কি কবিতা লিখলেন পালকির মধ্যে বসে? দেখি, পড়ে দেখি। খাতাতে পর পর দুটি নতুন কবিতা জন্ম নিয়েছে।

জীবন আমার যে অমৃত
আপন মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে

কবে আমি দেখব তাকে ?

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
পেয়েছি ত আপন মনে,
গন্ধ তারই মাঝে মাঝে
উদাস করে আমায় ডাকে।

নানা রঙের ছায়ায় বোনা
এই আলোকের অন্তরালে
আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
দেখব নাকি যাবার কালে ?

যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে ?

আর পরের কবিতাটি,

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।

হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি
পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।

চির জীবন আমার বীণা তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে
তাই ত আমার নানা সুরের তানে
তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধরে।

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই ত আমার তুমি
আবার তোমায় চিনব নূতন করে॥

কিছু বলার নেই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সতীশচন্দ্র চুপচাপ ফিরে এলেন নিজের পালকিতে। খানিক পরেই আবার চলা শুরু। ফিরতি পথে আর কোনো নতুন বিভ্রাট ঘটেনি। বিকেল পাঁচটা পঞ্চাশে চারুবাবুদের হাতি এবং রবীন্দ্রনাথের পালকি পৌঁছলো বেলা স্টেশনে। সতীশচন্দ্রের পালকি তার দশ মিনিট পরে।

'বেলা' স্টেশনে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খবরটি স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সতীশচন্দ্র আসামাত্র খবরটি দিয়েছিলেন।

জানতে পারলাম, 'ক'বাবু আপনারই ওপর যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে চলে গেছেন।

তার মানে?

স্টেশন মাস্টার এখুনি আমাকে বললেন, 'ক'বাবু আজ দুপুর একটার ট্রেনে গয়া ফিরে গেছেন।

চারুবাবুরা সতীশচন্দ্রের দিকে তাকালেন। এবং তিনি ওঁদের দিকে।

ব্যাপার বুঝতে কারু কোনো অসুবিধে নেই। সকাল ১০টার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রকে পালকিতে রওনা করিয়ে দিয়ে 'ক'বাবু টমটমের সন্ধানে বন্ধু জমিদারের গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন, তাঁবু, রান্নাবান্নার লোক, খাবারদাবার সব কিছুর যোগাড় তখনো বাকি, কোথাও বা খবরটুকু মাত্র পাঠানো হয়েছে বা হয়নি, আগেভাগে 'বরাবর' পাহাড় এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা।

তখন বেগতিক বুঝে 'ক'বাবু বুদ্ধিমানের মতো চম্পট দিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীদের রওনা করিয়ে দেওয়ার পর শেষমেশ কি অবস্থা তাঁদের দাঁড়ালো সে ব্যাপারে 'ক'বাবু আর মাথা ঘামানোর দরকার বোধ করেননি। অবশ্য উনি খুব লজ্জায় মর্মাহত হয়ে 'মুখ লুকিয়ে' পালিয়ে গেছেন, সেটাও হতে পারে।

যাই হোক, এ সব ভেবে আর লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে সতীশচন্দ্র প্লাটফর্ম চত্বরে ফিরে এলেন। এবং আসামাত্র

১২ জন পালকিবাহক, ২ জন মাহুত, একজন গাড়োয়ান বিগলিত হেসে তাঁর কাছে দাঁড়ালো।

হুজুর, আমাদের ভাড়াটা।

ভাড়া! সতীশচন্দ্রের কাছে একটি আধলাও নেই।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তিনি খুব মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলেন, আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কাল পরশু যে দিন ইচ্ছে গয়ায় গিয়ে আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে নিও। সেই সঙ্গে আমি তোমাদের ট্রেন-ভাড়াটাও দিয়ে দেবো।

ইতিমধ্যে চালু পেয়াদাটি সমস্যার সমাধান করে দিল। সে বলে, বাবু আপনি ঐ চাল ডাল ঘি সবজি সব জিনিস ওদের দিয়ে দিন। ওরা ভাগ করে নিক।

উত্তম প্রস্তাব। একবাক্যে সে প্রস্তাব মেনে নেয় সকলে।

তাও সতীশচন্দ্র বলে দিলেন, তোমাদের আরো কিছু পাওনা আছে। বেশ তো, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা—হিসেব ঠিক করে, যে কেউ একজন আমার বাড়িতে এসে নিয়ে যেও। আমি তার ট্রেন-ভাড়াও দেবো।

খুব খুশী মনে সকলে তাঁকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলো।

ওরা চলে যেতেই আরেকটি লোক পায়ে পায়ে এগিয়ে ওঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। কাঁচা খাবারদাবার জিনিসপত্র নিয়ে যে ছ'জন জোয়ান 'বরাবর' পাহাড়ের নিচে দৌড়ে এসেছিল, এ তাদেরই একজন। ঝরনার পাশে পালকিওয়ালাদের দলে ভিড়ে যেতে একে তিনি দেখেছিলেন।

চারুবাবুদের সঙ্গে হাতির পিঠে চড়ে চলে এসেছে সে। সেলাম করে বলল, হুজুর, এবার আমাদের জিনিসপত্রের দামগুলো—

দাবিটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না সতীশচন্দ্র। সর্বনাশ! এদেরও দাম বাকি? নাকি আগে একবার পেয়ে সুযোগ বুঝে আবার তাঁদের কাছ থেকে ডবল দাম আদায় করতে এসেছে?

জিনিসপত্রগুলোর দামও কি আমাদের দেয়ার কথা? কই না তো। কেন, মুনশীজীর কাছ থেকে পাওনি?

না হুজুর, মুনশীজী পরোয়ানা পাঠিয়েছিলেন জিনিসপত্র যোগাড় করে রাখতে। আমাদেরও তো অধিকাংশ কিনেই আনতে হয়েছে হুজুর। দামটা কার কাছ থেকে পাবো সে বিষয়ে মোড়লরা কিছু আমায় বলেনি।

লোকটা অসৎ নয়। নির্ভুল এবং ন্যায্য দাম লেখা একখানি কাগজ সে সতীশচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

কাগজখানির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সতীশচন্দ্র বলেন, দেখ বাবা, তোমাদের জিনিসপত্রের দাম দিতে পারার তো কিছুই এখন আমার কাছে নেই। তুমি বরং মুনশীজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো দামটা তিনিই দেবেন কি না। সম্ভবত তিনি দেবেন। আর যদি না দেন, তোমার কথা শুনে রেগে ওঠেন, তা হলে চুপচাপ চলে আসবে আমার কাছে। এই আমার ঠিকানা। জিনিসপত্রের উপযুক্ত দাম ট্রেন ভাড়া, সবই তুমি পাবে।

লোকটি খুশী মুখে বিদায় নেওয়া মাত্র সতীশচন্দ্র 'চালু' পেয়াদাটিকে ডেকে বলেন, ওহে, তুমি আমাকে এখন কিছু পয়সা ধার দিতে পারো? রবিবাবু আর তাঁর সঙ্গীদের তা হলে 'বেলা' স্টেশন থেকে কিছু কিনে খাওয়াতাম। ওঁদের অভুক্ত রেখেছি ভেবে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তোমার কাছে যা আছে আমাকে দিয়ে দাও। তুমি যা দেবে, গয়াতে পৌঁছে আমি তার ডবল পয়সা দেবো।

পেয়াদা মুখ চুন করে বলে, বাবু, আমার কাছেও যে কিছু নেই।

তাহলে?

সতীশচন্দ্র বলেন, এ স্টেশনের সবাই আমার অচেনা। কার কাছে ধার চাইব? কে দেবে? তুমি একটু দেখ না, কিছু ব্যবস্থা করতে পারো কি না! ঐ তো, হালুইকরের দোকান। তুমি একবার চটপট ওখানে যাও। বলে দেখ, যদি গরম গরম এক সের লুচি ভেজে দেয়? সঙ্গে আলুভাজা, কি যাই হোক, পারবে? হালুইকরকে বোলো, তার দোকানের কোনো ছোকরাকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিক, সে আমাদের সঙ্গে গয়ায় গিয়ে দাম নিয়ে আসবে। আমি তার ট্রেন-ভাড়া দেবো,

আর লুচি বাবদ যা ন্যায্য দাম, তার ডবল দেবো।

চেষ্টা করে দেখি বাবু।

পেয়াদা লম্বা লম্বা পায়ে হালুইকরের দোকানে ঢুকেছে। সতীশচন্দ্র নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মিষ্টির দোকানটার দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লুচি পাওয়া যাবে কি না কে জানে! একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, এখনো কিছু সময় বাকি।

খানিকক্ষণ পরে পেয়াদা বার হয়ে এল। হাতে তার একটা বড়ো ঠোঙা।

যাক্, লোকটা ওস্তাদ বটে! কিন্তু ওকে কেমন যেন দেখাচ্ছে? সেই পেয়াদা ঠিক তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই। কিন্তু যেন একটু গরমিল ঠেকে।

কাছে আসতে বুঝলেন কারণটা। পেয়াদাদের সবচেয়ে জবরদস্ত ব্যাপার, মাথার রঙিন পাগড়ি আর কোমরে ঘুন্টি বাঁধা বেল্ট। রঙিন পাগড়িটাই এখন তার মাথায় নেই, ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে। কি ব্যাপার? গেলো অতো বড় পাগড়ি পড়ে আর এলো খালি মাথায়!

লুচি পেলে? গরম?

না বাবু, গরম না। সকালে ভাজা। লুচির সঙ্গে আলুভাজা আর কয়েকটা লাড্ডু এনেছি।

যাক্, এনেছো যে এই ঢের। তা তোমার পাগড়ি কই?

হালুইকর কিছুতেই ধারে দিতে চায় না। বলে, তোমাদের চিনি না, দেবো কেন? আর, ওর দোকানে এমন কোনো কেউ নেই যে আমাদের সঙ্গে গয়া পর্যন্ত গিয়ে দাম নিয়ে আসতে পারে। অনেক বলা-কওয়ার পর আমার মাথার পাগড়িটা বাঁধা রেখে তবে এক সের লুচি দিলো।

শেষকালে পাগড়ি বাঁধা রেখে খাবার আনা? ছিঃ! অপমানে সতীশচন্দ্রের মুখ কালো হয়ে যায়। এর চেয়ে তো না আনাই যে ছিল ভালো।

পেয়াদাটি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বাবু, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি

কালকে 'বেলা' স্টেশনে এসে বাঁধা পাগড়ি ছাড়িয়ে নেবো।

ঠোঙা খুলে লুচি, আলুভাজা, লাড্ডুর চেহারা দেখে বিশেষ সুবিধে-জনক ঠেকে না। যাই হোক, করজোড়ে তিনি চারুবাবুদের ডাকলেন। শালপাতায় খাবার সার্ভ করলেন।

খেতে গিয়ে চারুবাবু, অসিতবাবু ও ত্রিগুণানন্দের কি ঝামেলা! হাতে টেনে ও-লুচি ছেঁড়া যায় না। দাঁতে ছেঁড়া যায়, কিন্তু চিবুতে প্রাণান্ত, চিবুচ্ছেন তো চিবুচ্ছেন। হালুইকর বলেছিল, লুচি সকালে ভাজা। কথা বোধ হয় ঠিক, কিন্তু কোন্ সকাল? কাল পরশু তরশু কিংবা আরো আগে? লাড্ডুগুলো থান-ইঁটের মতো এবং আলুভাজা অবর্ণনীয়। তবু ওঁরা মরীয়া ভাবে খানছয়েক করে লুচি খেয়ে জনপ্রতি দু'ঘটি জল ঢক ঢক করে গলায় ঢালেন।

সতীশচন্দ্র বোঝেন, এ খাদ্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে দিতে পারবেন না। তাই যা বাকি ছিল ঠোঙায় মুড়ে রাখলেন।

চারুবাবু বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, সে কি, আপনি খেলেন না?

আজ্ঞে, আমি আগেই অনেক খেয়ে নিয়েছি।

কি খেয়েছেন তা অবশ্য বললেন না। রাগের চোটে তখন তাঁর মন থেকে লুচি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। ঢক ঢক করে তিনিও জল খেয়ে নিলেন দু'ঘটি।

ট্রেন ছাড়বার সময় এলো। কিন্তু টিকিট কই? 'বেলা' স্টেশন মাস্টারের অনুমতি নিয়ে সতীশচন্দ্র আপাতত বিনা টিকিটেই সকলকে নিয়ে কামরায় ওঠেন। গয়া স্টেশনে পৌঁছে টিকিটের দাম দেবেন। বলা বাহুল্য যে, বিনা টিকিটের ব্যাপারটা সতীশচন্দ্র খুব কায়দায়, যাতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা বিলকুল টের না পান, ফাঁক বুঝে টুক করে স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে নেন। স্টেশন মাস্টার মশাই অতি ভদ্রলোক। রবীন্দ্রনাথকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। কাজেই এদিকে আর কোনো ঝামেলা বাধেনি।

ট্রেন ছুটেছে। কামরায় সতীশচন্দ্র বসেছেন রবীন্দ্রনাথের পাশে। খানিকক্ষণ ইতস্ততের পর বলেন, আজকের দুঃসহ অভিজ্ঞতা আপনার

অনেকদিন মনে থাকবে—না, রবিবাবু ?

রবীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দিলেন, অভিজ্ঞতাটা দুঃসহ কিনা বলা মুশকিল। তবে নতুন ধরনের বটে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, মেয়ে জামাই নাতি এলে হয়তো কিছু গোলমাল হতো, তারা যে আসেনি সেটা ভালোই।

কিন্তু রবিবাবু, আপনার নিজের—

না, আমার নিজের কোনো অসুবিধে হয়নি।

ঐ প্রসঙ্গের ইতি করে রবীন্দ্রনাথ তখুনি তাঁর খাতা খুললেন। সচল তাঁর পেনসিল। এবং আরেকটি অসাধারণ কবিতার জন্ম হলো অনতিবিলম্বে।

পথের সাথী, নমি বারংবার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহ নমস্কার।
ওগো নবপ্রভাত—জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহ নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার।

দুঃখের কথা এই, রবীন্দ্রনাথ যখন আধাত্ম্য জগতের 'পথের সাথী'কে বারংবার নমস্কার জানাচ্ছিলেন, বেচারা সতীশচন্দ্র তখন দুপুর একটার গাড়িতে 'বেলা' স্টেশন থেকে গয়ায় পালানো নিতান্ত বাস্তব জগতের 'পথের সাথী'টির কথা ভেবে দারুণ রাগে নিজের মনেই দাঁত কিড়মিড় করলেন!

সন্ধ্যে সাতটায় ট্রেন থামলো গয়া স্টেশনে। ওঁদের কামরার দরজা খুলে দিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

তাঁর প্রথম প্রশ্নটি, রবিবাবু, বেড়াতে গিয়ে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

না, কিছু অসুবিধে হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মুখে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলেন। বসন্তবাবুও সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভাতকুমারের পরনে পুরোদস্তুর স্যুট, ওঁর পোশাকের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, কি প্রভাত? তুমি তা হলে আজ রাত্রেই কলকাতা চললে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মক্কেলের টেলিগ্রাম বিকেল তিনটেয় এসেছে।

প্রভাতকুমারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ ওয়েটিং রুমের দিকে এগোচ্ছেন। বসন্তবাবু ওঁর পেছনে। সতীশচন্দ্র একদৌড়ে গিয়ে নিঃশব্দে বসন্তবাবুর হাতখানি ধরে একপাশে টেনে নিলেন। ফিস ফিস করে বলেন, আপনি আমায় গোটা পনরো টাকা দিন তো, এক্ষুনি!

তাঁর ভাবভঙ্গীতে বসন্তবাবু অবাক। মুখের দিকে তাকালেন কয়েকবার। কিন্তু কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে পকেট থেকে পনরো টাকা বার করে দিলেন। সতীশচন্দ্র তখুনি ফিরে এসে টিকিট কালেক-টরকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশন মাস্টারের কাছে যান। ভাড়া চুকিয়ে এবং রসিদ নিয়ে চলে এলেন ওয়েটিং রুমে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে জামাই নাতির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। মেয়ে এবং নাতির জ্বর, ব্যথা কমেছে অনেকটা। তাদের মুখ উৎফুল্ল। পাশে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে প্রভাতকুমার ও বসন্তবাবু।

ট্রেনে আসতে আসতে রবীন্দ্রনাথ যদিও সতীশচন্দ্রকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজকের ঘটনা নিয়ে বিশেষ মাতামাতি না করতে, কিন্তু তা কি সত্যি সত্যি মেনে নেওয়া সম্ভব?

প্রভাতকুমারকে তিনি হাতছানি দিয়ে বাইরে ডাকলেন। উনি ওয়েটিং রুম থেকে বের হয়ে আসা মাত্র জিজ্ঞেস করেন, দাদা, 'ক'বাবু কোথায়? আপনি কি আজ ওঁকে দুপুরে কিংবা বিকেলে দেখেছেন?

প্রভাতকুমার বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দেন, তার মানে? তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই এলেন।

তারপর একটু থমকে গিয়ে বললেন, তাও তো বটে, কই তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কামরায় তো ওঁকে দেখলাম না! কি ব্যাপার সতীশ?

দাদা, উনি আমাদের সঙ্গে আসেননি। দুপুর একটার ট্রেনে পালিয়ে এসেছেন। ওখানে কোনো ব্যবস্থা ছিল না, 'বরাবর' পাহাড় দেখা ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

প্রভাতকুমার পুরো এক মিনিট হাঁ করে রইলেন। তারপর খুব সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছো?

দাদা, এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আমার চেহারা দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে আমার এখন রঙ্গ-রসিকতার মূড? এক্ষুনি বসন্ত-বাবুর কাছ থেকে পনরো টাকা ধার নিয়ে ট্রেন-ভাড়া দিলাম।

প্রভাতকুমার হাঁক দিলেন, বসন্তবাবু, একবার এদিকে শুনে যান তো—

কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা পুরো বুঝে নিয়ে প্রথমটা ওঁরা হতবাক, তারপর দারুণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত। দুজনের রুদ্রমূর্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ঘটনাস্থলে এখন 'ক'বাবু উপস্থিত থাকলে অবিলম্বে এঁরা দুজন তাঁকে বেদম প্রহার দিতে শুরু করতেন।

খানিকক্ষণ তর্জনগর্জনের পর ওঁরা প্রায় দৌড়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকে গেলেন। সতীশচন্দ্রের এতক্ষণের চাপা ক্রোধ এঁদের ক্রুদ্ধমূর্তি দেখে খানিকটা হালকা। যাক, আজ না হয় কাল, ওঁরা দুজন 'ক'বাবুর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন নিশ্চয়। তাই তিনি চা-স্টল থেকে দু'ভাঁড় চা খেয়ে আসেন। ফিরে এসে দেখলেন, কোথা থেকে একটা ইজিচেয়ার এনে প্ল্যাটফর্মের নিরিবিলি দিকে পাতা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাতে বসে। আশেপাশে কয়েকজন গুণগ্রাহী। আর প্রভাতকুমার ওঁকে কিছু খেয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখ, দিনে তো আমি বিশেষ কিছু খাই না, তোমরা অতো ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মীরার বাস্কেটে কিছু ফল মিষ্টি আছে। আমি রাত্তিরবেলা ট্রেনে বসেই খেয়ে নেবো।

বসন্তবাবু শুনলেন না। তিনি জাদুকরের মতো কয়েক মিনিটের মধ্যে এক গেলাস সরবত আর ডিশে করে একটা আপেল নিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথও আর আপত্তি করেননি। খেতে খেতে বললেন, তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা 'ক'বাবুর ওপর কোনো অত্যাচার কোরো না। বেচারা ভদ্রলোক আগ্রহ করে আমাকে 'বরাবর' পাহাড়ের গুহা দেখাতে চেয়েছিলেন, চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, পারেননি, তাতে কি আর এমন দোষ! ভুল-বোঝাবুঝির জন্য ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে খবর পৌছোয়নি, তাই বিভ্রাট হলো। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে তোমাদের উত্তেজনাও কি অযথা নয়? বেচারা 'ক'বাবু এমনিতেই যথেষ্ট লজ্জিত, তোমরা তাঁকে আবার অপমান করে আমার লজ্জা বাড়িও না।

এইবার ঐ প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথ আরো নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ওঁরা হুঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন, খুব বেশি কথা বলছেন না। আসলে ওঁরা মূড ফিরে পাচ্ছেন না। মন তিক্ত, মূড আসবে কি করে? এবং ওঁরা যথেষ্ট কুণ্ঠিত ও লজ্জিতও। তিন দিনের জন্য বেড়াতে এসে রবিবাবুর এ কি বিড়ম্বনা!

তাঁরা যদি গোড়াতেই 'বরাবর' যাত্রার পরিকল্পনায় বাধা দিতেন, তা হলে এমন পরিস্থিতি নিশ্চয় হতো না। আর, যদি বা যেতে দিলেন, তবে ভালোমতো খোঁজখবর না নিয়ে 'ক'বাবুর ওপর ছেড়ে দিলেনই বা কেন? অতএব তাঁদের নিজেদের কর্তব্যেও যথেষ্ট শৈথিল্য হয়েছে। শুধু 'ক'বাবুর ওপর পুরো দোষ ঢেলে দিলে কি হবে। আর, 'ক'বাবুকেও বলিহারি। গয়াবাসী সব বাঙালীর মুখে একেবারে চুনকালি দিয়ে দিলেন!

হঠাৎ প্রভাতকুমার জিজ্ঞেস করেন, আপনি এলাহাবাদে ক'দিন থাকবেন? ওখান থেকেই সোজা শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন নাকি?

এখনো কিছু ঠিক করিনি। ভাবছি, এলাহাবাদে দিন সাতেক কাটিয়ে ওখান থেকে কাশ্মীর চলে যাবো। কাশ্মীরটা একবার দেখতে

খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কাশ্মীরে দিন কুড়ি কাটিয়ে তারপর ফিরবো। [প্রসঙ্গত বলে রাখি, সেযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর যাননি। এলাহাবাদে নিরিবিলি পরিবেশ পছন্দ করে পুরো তিন সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে ফেরেন শান্তিনিকেতন। কাশ্মীর তিনি গিয়েছিলেন প্রায় এক বছর পরে। দিন পনরো ছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরে তাঁর একদম জমেনি। খুব বাজে লেগেছিল। সে আবার আরেক কাহিনী।]

প্রভাতকুমার একটু অবাকভাবে বলেন, কই, আমাকে তো আগে আপনি বলেননি যে কাশ্মীর যাবেন?

না, হঠাৎ ঠিক করলাম।

প্রভাতকুমার বলেন, খুব ভালো কথা—সে জায়গা চমৎকার। তা রবিবাবু, আপনি ওখানে গিয়ে একটা হাউসবোট ভাড়া নেবেন। বাড়িকে বাড়ি, নৌকোকে নৌকো। নদীতে বেড়াতে খুব সুন্দর লাগবে আপনার।

হ্যাঁ, তাই নেবো ভাবছি। প্রভাত, তোমার তো কাশ্মীর ভালো রকমই ঘোরা আছে।

আজ্ঞে না, কাশ্মীর তো আমি যাইনি।

কি বললে?

আজ্ঞে, আমি তো কাশ্মীর কখনো যাইনি।

সে কি হে! তা হলে তোমার উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'তে কাশ্মীরের অতো জীবন্ত বর্ণনা, এক বাঙালী পরিবারের হাউসবোটে জীবনযাত্রার অতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, তাদের কাশ্মীর উপভোগের আনন্দ লিখলে কি ভাবে? তুমি সত্যি কাশ্মীর যাওনি?

আজ্ঞে ও বর্ণনাগুলো বানিয়ে বানিয়ে লেখা। বিলেতে যখন ছিলাম, তখন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে বসে লিখেছি।

ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মুখে কৌতুকের হাসি উপচে পড়ছে। বললেন, তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক হে, প্রভাত! আমি তো তোমায় এতোকাল ভালো মানুষ বলেই জানতুম। তুমি কালকে সকালে আমায় 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসখানা দিয়ে গেলে, কাল

দুপুরে ও-বইটা পড়তে পড়তেই তো হঠাৎ কাশ্মীর যাওয়ার ইচ্ছে হলো। ভাবলাম, প্রভাতকুমার যখন ঘুরে এসেছে, তা হলে আমারও কাশ্মীর দেখা বাকি থাকে কেন? এমন বর্ণনা লিখলে যে পড়ে আমি কাশ্মীর দেখতে ছুটলাম, আর তুমি নিজেই ওখানে যাওনি!,

বসন্তবাবু ও আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসছেন। রবীন্দ্রনাথের তারিফে স্বভাবে লাজুক প্রভাতকুমার মুচকি মুচকি হাসেন। সে হাসি সবটাই আনন্দ-মাখা।

প্রাণখোলা আনন্দের হাসিতে এতোক্ষণের থমথমে ভাব কোথায় উধাও। তিক্ত প্রসঙ্গকে সত্যি পুরো ঝেড়ে ফেলে সকলে খুব সহজ ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ট্রেন না আসা পর্যন্ত বাকি সময়টা কাটলো চমৎকার।

এর পর কুড়ি মিনিটের তফাতে দুটি ট্রেনে দুজনে রওনা দিলেন দু'দিকে। রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের পথে এবং প্রভাতকুমার কলকাতায়।

জীবন যখন শুকায়ে যায়

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দু'চারটি স্তিমিত তারা। চাঁদের দেখা নেই। প্রকাণ্ড বাড়ি নিশ্চুপ, শুধু তেতলার অন্তঃপুরের ঘরে কয়েকজনের নিঃশব্দ আনাগোনা।

বাড়ির ছোট ছেলেরা দোতলার ঘরে ঘুমিয়ে। ঘরের কোণে টিমটিম করে জ্বলে রেড়ির তেলের এক পলতের বাতি। অনেককালের পুরনো ঝি প্যারী বুড়ি হঠাৎ শেষরাতে নিটুট নৈঃশব্দ্য ভেঙে একদৌড়ে ছোট-দের ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে, তোদের কি সর্বনাশ হল রে!'

আকস্মিক চিৎকারে জেগে ছোটরা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। তখুনি দ্রুতপদে ঘরে এলেন নতুন বৌঠান—কাদম্বরী দেবী।

ষোল বছরের এই শান্তমূর্তি, লাবণ্যময়ী বালিকা বধূর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করার সাধ্য কারো ছিল না, তিনি প্যারী বুড়িকে ধমক দিয়ে হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে যান।

ঘর আবার নিস্তব্ধ। রেড়ির তেলের প্রদীপশিখার রহস্যময় ছায়া দেওয়ালে কাঁপে। চোদ্দ বছর বয়সী বালক রবি স্তম্ভিত হৃদয়ে বসে আছেন আধো আঁধারে। কি এমন সর্বনাশ ঘটতে পারে ভেবে কূল-কিনারা কিছু পান না। ফের গভীর ঘুমের ঢুলুনি নামল ওঁর চোখের পাতায়।

পরের দিন ভোরবেলা জানলেন তাঁর মা'র মৃত্যুসংবাদ। বাইরের বারান্দায় রাখা খাটে অজস্র ফুল ও চন্দনে ভূষিতা মা সারদা দেবী। ব্যাধির মালিন্য তাঁকে একটুও ছুঁতে পারেনি। যেন পরম নিশ্চিন্ত ঘুমে মগ্ন, মায়ের স্নিগ্ধ মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রবি। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

চোদ্দ বছরের বালক রবির জীবনে এই প্রথম মৃত্যুশোক। কিন্তু কৈ, মনের গভীরে বেদনার ঝঙ্কার তো তেমন বাজল না। মাকে কখনও খুব কাছে পাননি, একই বাড়িতে থেকেও কেমন দূরে দূরে ছিলেন মা। তাই মায়ের অভাব তাঁর মনে তেমন সাড়া জাগাবে কি ভাবে? সেদিন ভোরের আলোয় মৃত্যুকে তাঁর আদৌ ভয়ংকর বলে মনে হয়নি।

ঐ দুঃখের দিনে রবি কাঁদেননি। একটুও না। শববাহকের দল যখন মায়ের খাট কাঁধে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে নিমতলা শ্মশানের দিকে রওনা হল, শুধু তখন, ওদের পিছু পিছু চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য বালক রবি হাহাকারে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, "মা এই যে বাড়ির দরজা দিয়ে বার হয়ে এলেন, এই তো তাঁর শেষ যাত্রা —তাঁর সাধের সংসারের ঘরকন্নার কাজে আর ফিরে আসবেন না কোনো দিন।"

দাহকার্য শেষ হতে বেলা অনেক, শ্মশানঘাট থেকে রবি ফিরে আসেন দুপুর প্রায় দুটোয়। গলির মোড় থেকে তাঁদের বাড়ির তেতলার ঘর ও তার সামনের বারান্দা স্পষ্ট দেখা যায়। এ ঘরে থাকেন মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ। দেখলেন বারান্দায় স্থির হয়ে মহর্ষি একাগ্রচিত্তে উপাসনারত। শোকদুঃখে নিস্পৃহ পিতৃদেবের অকম্পিত হিমালয়ের মতো মূর্তিটি রবির মনে গভীর রেখায় আঁকা হল চিরদিনের জন্য।

পরবর্তীকালে তরুণ রবি তাঁর চাদরের খুঁটে একমুঠো বেলফুলের কুঁড়ি বেঁধে কতদিন বাড়ির ছাদে বা বাগানে উদ্দেশ্যবিহীন খ্যাপার মতো ঘুরেছেন, সেটা ছিল তাঁর কবিচিত্তের উন্মেষের সময়। আশ্চর্যের কথা, সেই শুভ্র বেলকুঁড়িগুলির দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়েছে বার বার। মায়ের আঙুলগুলিও ছিল এমনি শুভ্র, এমনি সুচিক্কণ, এমনি কোমল।

মাতৃহীন বালককে বুকের কাছটিতে টেনে নেন দুজন—নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং বৌঠান কাদম্বরী দেবী। রবির জীবনে এঁরা এলেন ধ্রুবতারার মতো। বস্তুত, রবির দীর্ঘজীবনের সবচেয়ে সুখের সময় কেটেছে এঁদের আশ্রয়েই। অপর্যাপ্ত স্নেহ-ভালবাসায় ভরা স্বপ্নের দিনগুলি রবীন্দ্রনাথ ভুলে যাননি কখনও। এবং ওঁর জীবনে এমন মাধুর্যে ভরা ন'টি বছর আর ফিরেও আসেনি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তখন সাহিত্য ও সংগীতের জোয়ার। কিশোর রবিকে সেই সাহিত্য ও সংগীতের মহোৎসবে সাদরে সামিল করে নিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অত্যন্ত দ্রুত বাংলা লিখতে পারতেন কিশোর রবি। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস। তাঁর রচনার মধ্যে নতুন বৌঠান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোর মশাল। তাই বিপুল স্নেহে কিশোরকে নানান হতাশা, বেদনা, তাচ্ছিল্য থেকে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখতেন।

সোনালি রঙের অসংখ্য দিনের মধ্যে এক বিশেষ দিনের স্মৃতি রবির মনে গাঁথা। জ্যোতিদাদা মধ্যে মধ্যে হাওয়া বদলাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে গঙ্গার ধারে কোনো বাগানবাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। সঙ্গী মাত্র দুজন। কাদম্বরী দেবী ও রবি।

গঙ্গার দু'ধারে তখনও কলকারখানার আবির্ভাব ঘটেনি। প্রকৃতি

দেবীর আসন ছিল পাতা। সেবার বর্ষায় ছোট একটি দোতলা বাড়িতে এলেন তাঁরা। বর্ষার সে কি অসামান্য রূপ! গঙ্গার জলে গেরুয়া রঙের ঢল নেমেছে। ওপারে বনের মাথায় ঘন কালো মেঘের ছায়া।'

কিশোর রবির মনে গুঞ্জরিত হল বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদটি "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর,/ শূন্য মন্দির মোর।" সুর দিয়ে গানে রূপান্তরিত করলেন পদটিকে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে বর্ষাঋতুর যে বিপুল সমারোহ দেখা দেয়—সেই সমারোহের সর্বপ্রথম বর্ষাসঙ্গীত রচিত হল এদিন। বৌঠান কি কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে আসতেই রবি গানটি শুনিয়ে দেন তাঁকে। ঝমঝম করে তখন বৃষ্টি নেমেছে, হু-হু করে বইছে ঝোড়ো হাওয়া, কূলে কূলে ভরা গঙ্গার ঢেউয়ের শব্দ একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

রবির কিন্নরকণ্ঠে প্রথম বর্ষাসঙ্গীত এমন পরিবেশেই একাগ্রচিত্তে শুনলেন বৌঠান। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ভাল লাগল কি খারাপ লাগল, একটি কথাও বলেননি। কিন্তু কিছু না বলার মধ্যেই তাঁর সব কথা বলা হয়ে গিয়েছিল।

বর্ষাসঙ্গীতের সেই শুরু। পরবর্তীকালে অসামান্য দিনটির স্মরণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল দিনটি আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে।"

মাত্র তেইশ বছর বয়সের মধ্যে তেরোখানি গ্রন্থ রচনা করেন—কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, সন্ধ্যাসংগীত, কালমৃগয়া, বউঠাকুরাণীর হাট, প্রভাতসংগীত, বিবিধ প্রবন্ধ, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এবং চারটি কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গিত। বাকি পাঁচটি উৎসর্গপত্র-শূন্য।

১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের বিয়ে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারে যখন আনন্দ উপচে পড়ছে, ঠিক সেই সময়ে, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কয়েক মাস পরেই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলেন বৌঠান। আত্মহত্যার কারণ আজও অজ্ঞাত। তবে, অনেকের অনুমান,

এবং খুব সম্ভবত এটাই সত্য যে, স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে মত-বিরোধের ফলে এমন শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিলেন অভিমানী কাদম্বরী দেবী।

সেদিনটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল। সোনার প্রতিমা ঘরের মেঝেতে নিস্পন্দ দেহে শুয়ে আছেন। চোখের পাতা বোজা। তাঁকে ঘিরে স্তব্ধ স্তম্ভিত ঠাকুরবাড়ির পরিজনেরা। বৌঠানের বয়েস তখন মাত্র পঁচিশ।

তরুণ রবিকে মৃত্যুশোক এই প্রথম স্পর্শ করল। শুধু স্পর্শই নয়, তীক্ষ্ণধার তলোয়ার তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত হল অত্যন্ত গভীর ভাবে—মৃত্যুকে তার ভয়ংকর রূপে চিনলেন, জানলেন। "আমার তেইশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না। সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্ম-

খণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিব কেমন করিয়া।"

বেশ কিছুদিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ থেকে দূরে সরে গেলেন তরুণ রবি। নিদ্রাহীন রাতে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ান একা একা, কখনো বা স্তব্ধ হয়ে ছাতে বসে থাকেন রাতের অন্ধকারে। প্রবল বর্ষা ও দারুণ শীতে তিনতলার খোলা বারান্দার মেঝেতে রাতের পর রাত কাটল। সামাজিকতার ঠাট বজায় রাখা, সাজপোশাক এবং খাওয়াদাওয়ার দিকেও এ সময়ে তাঁর নিদারুণ উপেক্ষার ভাব দেখা যায়, ধুতির ওপর খালি গায়ে যেমন তেমন একখানি মোটা চাদর জড়িয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন, এমন কি ঐ পোশাকে ধর্মতলার সাহেবী দোকানে বই কিনতে গেছেন পর্যন্ত।

কিন্তু ক্রমে তাঁর জীবন থেকে অশ্রুসিক্ত দিনগুলি বিদায় নিল। নতুন সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টির কাজে আবার এগিয়ে এলেন তিনি। বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার উপচে এল তাঁর অলৌকিক প্রতিভার দানে। আশ্চর্যের কথা—কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর রচনাগুলি আরো অনেক উজ্জ্বল, বিচিত্র রূপ ও রঙে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বৈরাগ্য নয়, আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এ দারুণ শোককে অতিক্রম করলেন তরুণ রবি। অন্তরের তীব্র বেদনা একান্তই তো তাঁর, বাইরের লোকের চোখের সামনে তাকে টেনে এনে কি লাভ?

কিন্তু পরবর্তীকালে খ্যাতির সিংহাসনে বসেও রবীন্দ্রনাথ অন্তরের নিভৃত কোণে বালকের মতো তৃষিত থেকেছেন হারিয়ে যাওয়া নতুন বৌঠানের অনাবিল স্নেহের জন্য।

বৌঠানের মৃত্যুর অনেক বছর পরে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী অবলা বসুর কাছে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে শুধু একবার ওঁর হৃদয়ের গভীর বেদনার সামান্য প্রকাশ চকিতে দেখা দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ।

"মাননীয়াসু,

আপনাকে একটি কাজ করতে হবে, আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা

প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন, যদি স্নেহ করেন তো বাঁচি—তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠান ছিলেন, আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম—সেই বউঠাকরুণকে হারাবার পর আমার দ্রুত পদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান হয়েছি। আমাকে যদি 'আপনি' বলা ছেড়ে দিয়ে 'তুমি' বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হতে পারেন তো উত্তম। যদি অসাধ্য বোধ করেন, তবে অন্তত পত্রে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না…।'

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবিপ্রতিভা আরো ভাস্বর। কিন্তু এর পাশাপাশি মৃত্যু প্রসারিত করেছে গাঢ় কালো ছায়া। অতি প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটল অকস্মাৎ (১৮৭০-১৮৯৯)। মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই প্রতিভাবান যুবক মাত্র ২৯ বছর বয়েসসীমার মধ্যেই বাংলা গদ্য রচনায় বহু জ্ঞানী গুণী সমজদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাব্যময় ভাষায় চমৎকার প্রবন্ধ লিখতেন। লেখার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যেত।

রবিকাকা ও কাকীমা মৃণালিনী দেবীর প্রতি বলেন্দ্রনাথের খুব বেশি ঝোঁক ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথকে গুরু মেনেই ওঁর সাহিত্যসাধনা। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ লেখার আগে, বিষয়বস্তু প্রথমে ঠিক করে নিয়ে তিনি আলোচনায় বসতেন রবিকাকার সঙ্গে। পরামর্শ নিতেন। তারপর লেখা শেষ হলে কাকার নির্দেশ অনুযায়ী কাটছাঁট অদলবদল করতেন। কাকার স্নেহ পেয়েছিলেন খুব। ওঁর রচনাশক্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় আস্থা ছিল। এবং সেই কারণে নিজের ছেলের মতো, যত্নে, ধীরে ধীরে 'তৈরি' করছিলেন ভাইপোকে। কিন্তু সে আশা অপূর্ণই রয়ে যায়।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র আড়াই বছর পরই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অকাল মৃত্যু (১৮৭৩-১৯০২)। ওঁর রোগটি আসলে কি, স্পষ্ট বলা মুশকিল। রোগের লক্ষণ আলোচনা করে পরবর্তীকালে অনেকের ধারণা, খুব সম্ভবতঃ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন এদেশে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের তেমন চিকিৎসা ছিল না। অপারেশন

পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। তাছাড়া ডাক্তাররাও রোগ ধরতে পারেননি, খানিকটা যেন আন্দাজে চিকিৎসা চলে—প্রথমে অ্যালোপ্যাথী, পরে হোমিওপ্যাথী।

উপযুক্ত খরচখরচা করে চিকিৎসাও কি হয়েছিল ওঁর? সন্দেহ রয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়ে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থা। অথচ নানান সমস্যা ও দায়িত্বের বোঝা কাঁধের ওপর যথেষ্ট। নিজের সংগ্রহ করা সাধের বইপত্র, সখের জিনিস, বিয়েতে পাওয়া উপহার এবং স্ত্রীর গায়ের গয়না পর্যন্ত বিক্রি শেষ। অসুস্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ বোলপুরে রয়েছেন দারিদ্র্যের মধ্যে। লোকবলও নেই।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, অর্থের অভাব থাকলেও সেবার অভাব মৃণালিনী দেবীর হয়নি। সেদিক থেকে তিনি অশেষ ভাগ্যবতী। রবীন্দ্রনাথ দিনরাত তাঁর স্ত্রীর শয্যার পাশে ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। দু'এক ঘণ্টা কোনো রকমে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে প্রায় পুরো রাত জেগে বসে থাকতেন। অভাবের দৈন্য মুছে গিয়েছিল হৃদয়ভরা মমতায়, সেবায়।

অবশেষে মর্মান্তিক দিনটি এসে গেল। ডাক্তার মাথা নিচু করে ঘর থেকে চলে গেছেন। স্বামী এবং বড় ছেলের দিকে মৃণালিনী দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছে। তাঁর ঠোঁট দুটি কি যেন বলবার জন্য বৃথাই কেঁপে কেঁপে ওঠে। কণ্ঠ থেকে বার হয়ে আসছে খুব অস্পষ্ট শব্দ। স্বামীকে কি যেন শেষ কথা জানিয়ে যেতে চান। কিন্তু কথা বলার শক্তি তখন আর তাঁর নেই—বাকরোধ হয়েছে। অসহায় জলে ভাসা চোখে স্বামী আর ছেলেকে খালি দেখছেন, দেখার তেষ্টা যে কিছুতেই মেটে না! ৭ই অগ্রাণের রাত, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। মৃণালিনীর বয়স মাত্র ২৯ বছর।

চোখের জল মনের গভীরেই কেঁদে ফেরে, রবীন্দ্রনাথ বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ অচঞ্চল, স্থির, মুখের ভাব অতি প্রশান্ত, শুধু চোখের নিচে গাঢ় কালিমা। লোকজনের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করছেন স্ত্রীর সৎকারের প্রসঙ্গ।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে অন্তরের বেদনার একটুখানি প্রকাশ করে

ফেলেছিলেন ১৪ বছরের ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছে। মৃণালিনী দেবীর চটিজোড়া সযত্নে এনে রথীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "এটা তোর মায়ের খুব প্রিয় চটি। তোর কাছে যত্ন করে রেখে দিস, হারাস নি, তোকেই দিলুম।"

সারা জীবন নিজের কাছে পরম যত্নে চটিজোড়াটি রেখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। বর্তমানে এটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায় রাখা।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও কন্যাদের সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, ওঁর দুই ছেলে তিন মেয়ে। এঁরা যথাক্রমে, মাধুরীলতা (বেলা), রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা, শমীন্দ্রনাথ।

মৃণালিনী দেবী বেঁচে থাকতে থাকতেই, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুই মেয়ে মাধুরীলতা (বেলা) ও রেণুকা-র বিয়ে দেন। বিয়ে হয়তো আরো কিছুদিন পরে দিতেন, কিন্তু স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছেয় ও চাপাচাপিতে কিছু তাড়াতাড়িতেই তাঁকে এ ব্যবস্থা করতে হল। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে দু মেয়ের বিয়ে। মাধুরীলতা (বেলা)-র বয়েস তখন চোদ্দ এবং রেণুকার সাড়ে এগারো। বড় জামাইয়ের নাম শরৎ চক্রবর্তী। তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চতুর্থ ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করবার পর তিনি ল পাশ করে আইন-ব্যবসায়ে রত ছিলেন। দ্বিতীয় বা মেজ জামাইয়ের নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইনি ছিলেন ডাক্তার।

বিয়ের পর বছর ঘুরল না, রেণুকা গুরুতর অসুস্থতায় শয্যাশায়ী, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে রায় দিলেন—যক্ষ্মা।

এ রোগ সে যুগে প্রায় দুরারোগ্য। লোকে চলতি কথায় "রাজব্যাধি" বলত। শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে নিজের কাছে আনিয়ে রেখে চিকিৎসা শুরু করলেন। অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী—কিছুর বাদ নেই। কিন্তু সুফল কোথায়? বরং দিন দিন রেণুকার দেহে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। মেয়েও হয়েছে তেমনি। বাবার হাতে ছাড়া ওষুধ কি পথ্য কিছুতেই খাবে না। অন্য কেউ দিতে এলে দাঁতে দাঁত টিপে থাকবে। সর্বদা তার বাপকে কাছে চাই। ঘুমন্ত

অবস্থা থেকেও চমকে চমকে জেগে চোখ ফিরিয়ে দেখে, বাবা পাশে আছেন কি নেই। বাবার হাতখানি তার মাথার চুলে সন্তর্পণে রাখা আছে দেখলেই খুশির হাসি হেসে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে পড়ে শোনান যাতে মেয়ে কিছুক্ষণ অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। ঐ কবিতাগুলি দিয়েই তাঁর "শিশু" বইখানি লেখা।

স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাস পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাজারিবাগ গেলেন—যদি হাওয়া বদলে রেণুকার অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে।

অত দুঃখেও অসামান্য সাহিত্যসৃষ্টির এতটুকু বিরাম নেই। রথের চাকার দুর্দমনীয় গতিতে তা ছুটে চলেছে। পর পর অনেকগুলি রচনা শেষ করেন হাজারিবাগে। নতুন উপন্যাস "নৌকাডুবি"র সূচনাও এখানে। কিস্তিতে কিস্তিতে এক-একটা পরিচ্ছেদ লিখে কলকাতায় পাঠাচ্ছেন।

রেণুকার স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির দিকে, লক্ষণ ভাল না দেখে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় একাই ফিরে এলেন ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। কলকাতার ডাক্তাররা এবার নির্দেশ দিলেন রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়ায় চলে যেতে। যক্ষ্মা-রোগীদের পক্ষে নাকি আলমোড়ার শুকনো আবহাওয়া ভাল।

আবার হাজারিবাগ। তারপর মেয়েকে নিয়ে রওনা দেন আল-মোড়ায়। সে-যুগে এইসব জায়গার রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল খুব শোচনীয়, যানবাহনেরও অভাব অত্যন্ত। বহুকষ্টে রুগ্না মেয়েকে পথের দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে পৌঁছলেন। কিছুদিন আলমোড়ায় থাকার পর সত্যি দেখা গেল রেণুকার অসুখ অনেকটা উন্নতির দিকে চলেছে। মনে স্বস্তি ফিরে এল তাঁর—যাক, হয়ত আর কিছুদিন পরে সুস্থ মেয়েকে নিয়ে হাসিমুখে কলকাতায় যেতে পারবেন।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ মাসের পর মাস কলকাতার বাইরে থাকার ফলে কাজকর্মের যেমন গুরুতর সঙ্কট দেখা দিল, বাকি চারটি সন্তান, যারা

সকলেই কলকাতায়, তাদের কথাও তো ভাবতে হবে। পারিবারিক সামাজিক নানান দায়দায়িত্বও আছে। অতিপ্রিয় ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে।

রেণুকাকে আলমোড়ায় তার মামার কাছে রেখে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এলেন রবীন্দ্রনাথ। ওঁকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে ঠাকুর পরিবারে আনন্দের সীমা নেই—ঠিক এমনি সময়ে আলমোড়া থেকে টেলিগ্রাম, 'রেণুকার অবস্থা খুব খারাপ, শিগগির ফিরে আসুন।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার আলমোড়ায় ছুটলেন রবীন্দ্রনাথ। গিয়ে দেখেন, মেয়ের অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। রাজরোগ ভালোর দিকে চলতে চলতে আচমকা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। খুব দুর্লক্ষণ।

রেণুকাও যেন শুনতে পায় আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি। সে কিছুতেই আর আলমোড়ায় থাকতে চাইল না, বলল, "বাবা, এবার আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল। বাড়ির লোকজন কতদিন দেখি না, ওদের দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

কথাগুলির মধ্যেই যেন রেণুকার আর্ত মিনতি লুকিয়ে ছিল, "বাবা, আমার জন্যে তো অনেক করলে, কিন্তু জানি আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমাকে এ নির্বান্ধব জায়গায় আর চিকিৎসা না করে কলকাতায় প্রিয়জনদের কাছে মরতে দাও।"

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর দিন দুয়েকের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে ফিরতিপথে কলকাতার দিকে রওনা। পথ অতি দুর্গম। অথচ যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। এদিকে মেয়ের শরীরের এমন অবস্থা যে একেবারে শুইয়ে না আনলে আনা অসম্ভব। বহুকষ্টে অনেক বেশি টাকা কবুল করে কয়েকজন লোককে রাজী করানোও গেল—তারা একেবারে খাটসুদ্ধ ধরে রেণুকাকে পাহাড় থেকে নামাবে।

কাঠগুদাম রেল স্টেশন আলমোড়া থেকে বড় রাস্তা দিয়ে প্রায় আশি মাইল। কিন্তু পাহাড়ী পায়ে-চলা-পথ ধরলে চলা অনেক কষ্টকর হলেও শর্টকাটে বত্রিশ মাইল হেঁটে কাঠগুদাম পৌঁছানো যায়। ঠিক

হল, মেয়ে যাবে খাটে আর তার পাশে পাশে হেঁটে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। ভোররাত্তিরে যাত্রা করে বত্রিশ মাইল পাহাড়ী রাস্তায় হেঁটে পরিশ্রান্ত অবস্থায় সন্ধ্যেবেলা স্টেশনে পৌঁছে শোনেন ট্রেন আধঘণ্টা আগে চলে গেছে।

থাকার জায়গা নেই। পরের দিন সন্ধ্যের আগে কলকাতা যাওয়ার কোনো ট্রেনও নেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। পথশ্রমে রেণুকার অবস্থা খুব উদ্বেগজনক, মেয়েকে বুকে ধরে নির্বাক বসে আছেন অসহায় পিতা। কি ভাবে সেই রাত্তির আর পরের দিন সকাল দুপুর কাটে সে ভয়ংকর পরিস্থিতি বর্ণনাতীত।

অবশেষে পরের সন্ধ্যায় ট্রেন তো এল। কিন্তু বিপদের শেষ তখনও হয়নি। পথে মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেন থামতে তিনি মেয়ের জন্য একটু দুধ যোগাড় করতে নেমেছেন, ফিরে এসে দেখেন তাঁর টাকার ব্যাগ উধাও। অর্ধমৃত, ঘুমন্ত বালিকার পাশ থেকে টাকার ব্যাগ উঠিয়ে নেবার এমন সহজ সুযোগ কি চোর ছাড়ে?

স্তম্ভিত ভাবে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের শিয়রে আবার বসলেন। তার মাথায় চুলে হাত রাখলেন। হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন আস্তে আস্তে। মেয়ে ঘুম ভেঙে আধো জাগ্রত অবস্থায় জিজ্ঞেস করে, "তুমি আছ বাবা?"

"হ্যাঁ, মা, আছি।"

"আর ভয় নেই?"

"না, মা, আর ভয় নেই।"

মরণাপন্ন রোগী সঙ্গে অথচ হাতে একটা পয়সা নেই। তিনি কেমন ভাবে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ফিরে এলেন সে কথা ভাবতে যেন গায়ে কাঁটা দেয় আমাদের।

রেণুকার যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন থেকে তাকে নিয়ে গোলমাল। তাকে নিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনা শুনেছেন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও, এবং দিনে দিনে সে সমালোচনা তিক্ততর হয়েছে।

ছেলেবেলা থেকে রেণুকার প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। অত্যন্ত জেদী ও একগুঁয়ে। যা একবার ঠিক করত কার সাধ্য তার মত বদলায়। বকাবকি, শাস্তি, মারধোর কিছুতেই কিছু হবার নয়। বরং মারধোরের পর তার জেদ আরও বাড়ত। মাছ, মাংস, ডিম বা অন্যান্য সুখাদ্য খেতে তার ঘোর আপত্তি, একটু দামী বা ভাল পোশাক হলেও পরতে চাইত না। শত জবরদস্তি করেও একটুকরো গয়না তাকে পরানো যায়নি কোনো দিন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ঐশ্বর্যের মধ্যে বালিকা ছিল যেন এক সন্ন্যাসিনী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বড় ভালোবাসতেন রেণুকাকে। সমালোচনা, ভং'সনা, শাস্তির হাত থেকে তাকে বাঁচাতে বুকের কাছে আগলে রাখতেন, বলতেন, "ও হলই বা একটু আলাদা রকমের, তাতে ক্ষতি কি ? এমনিতে যখন নিজের মনে শান্ত হয়েই থাকে, তখন কি দরকার ওকে উত্ত্যক্ত করার ?"

রেণুকাও সব সময়ে আঁকড়ে থাকতে চাইত বাবাকে, বাবাকে ঘিরেই ছিল তার জগৎ।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি দিয়ে আসার পর রেণুকার অবস্থা উন্নতির বদলে ক্রমেই দ্রুত অবনতির দিকে যায়। জীবন-প্রদীপের শিখা স্তিমিততর।

অবিভক্ত সমগ্র বাংলা দেশে তখন চলেছে জাতীয় চেতনার উন্মেষের এক অভূতপূর্ব কল্লোল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। তৎকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, মনীষী, মনস্বী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক সকলেই ঘন ঘন আসছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ ও আলোচনার জন্য। কলকাতায় এ সময়ে ওঁর উপস্থিতিতে সকলে দারুণ উৎসাহিত।

এমনি এক দিনে রেণুকার মৃত্যু হল। সকাল থেকেই বাবার ডান হাতটি আঁকড়ে ধরে চুপ করে শুয়ে ছিল সে। একবার বলল, "বাবা, তুমি আজ আমার কাছ থেকে কোথাও যেও না।"

"না, মা কোথাও যাব না।"

রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে তার মাথার উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুলগুলিকে ঠিক করে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ রেণুকা ফুঁপিয়ে উঠে বলে, "বাবা, সব যে অন্ধকার হয়ে গেল, কিছুই যে আর দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে 'পিতা নোঽসি' মন্ত্র পড়ে শোনাও।"

অবসন্ন দুই নয়নের প্রান্ত থেকে কয়েক ফোঁটা জল নামল।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এ দিনটির স্মরণে বলেছেন, "আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। রাণী (রেণুকা) তার জীবনের চরম মুহূর্তে কেন 'পিতা নোঽসি' স্মরণ করল, তার ঠিক মানেটা আমি বুঝতে পারলুম। তার বাবাই যে তার জীবনের সব ছিল, তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতেই হল, তখনও সেই বাবার হাত ধরেই সে দরজাটুকু পার হয়ে যেতে চেয়েছিল। তখনও তার বাবাই একমাত্র ভরসা এবং আশ্রয়। বাবা কাছে আছে জানলে আর কোনো ভয় নেই। সেইজন্যে ভগবানকেও পিতারূপেই কল্পনা করে তাঁর হাত ধরে অজানা অন্ধকার পথের ভয় কাটাবার চেষ্টা করেছিল। এই সম্বন্ধের চেয়ে আর কোনো সম্বন্ধ তার কাছে বেশি সত্য হয়ে ওঠেনি। তার সেই শেষ কথা যখন তখন আমি শুনতে পাই—"বাবা, 'পিতা নোঽসি' বল।"

সেদিন সন্ধ্যে থেকে ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানায় জাঁদরেল জাঁদরেল নেতারা এসেছেন। কথায় কথায় রাত সাড়ে দশটা। বৈঠক-শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জুতোয় পা গলিয়ে ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে রোজের অভ্যেসমত জিজ্ঞেস করলেন, "রবিবাবু, আজ আপনার মেয়ে কেমন আছে? একটু ভাল তো?"

রবীন্দ্রনাথ শান্তকণ্ঠে জবাব দেন, "সে আজ মারা গেছে।"

"কী—কী বললেন?"

"রাণী আজ মারা গেছে। দুপুরে।"

অতিথিরা স্তম্ভিত! তাঁদের হতবাক্‌ বদ্ধদৃষ্টি ঘোরাফেরা করে রবীন্দ্রনাথের শান্ত স্থির মুখের দিকে। কি অপূর্ব সুন্দর আয়ত চোখের

চাউনি। স্নিগ্ধ, যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, শরীরে শিহরণ জাগে!

আর দাঁড়ানো সম্ভব? মাথা নিচু করে মাননীয় অতিথিরা দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন তখুনি।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর দশ মাসের মধ্যে রেণুকা (রাণী) চলে গেল। বয়েস তখন তার মাত্র তেরো।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সে মৃত্যু হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫)। এর মাত্র দু বছর পরেই আবার মৃত্যু-অতিথি এল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তাঁর ছোট ছেলে, তেরো বছর বয়সী শমীন্দ্রনাথের পালা এবারে। যাঁরা শমীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, একবাক্যে তাঁরা একমত যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল সবচেয়ে বেশি ছিল এরই। শিশু বয়সেই তার মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে—এমন কি সময়ে সময়ে শিশু শমীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসজ্ঞ মনের প্রকাশে রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করতেন তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান চমৎকার আবৃত্তি করার এবং গেয়ে শোনানোর দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তার।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে শান্তিনিকেতনের দুই অধ্যাপকের সঙ্গে মুঙ্গের বেড়াতে যায় শমীন্দ্রনাথ, আর ফিরে এল না। কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে। দিনটা ছিল তেইশে নভেম্বর।

খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন মুঙ্গের পৌঁছলেন, তখন শমীর শেষ অবস্থা। ভোরের দিকে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তখন তার শিয়রে পাথরের মতো স্থির, ধ্যানমগ্ন। খানিকক্ষণ পরে অধ্যাপক দুজনকে ডেকে শান্তকণ্ঠে বলেন, "আমি তো কৃত্য করে দিলাম, এবার আপনারা শমীকে দাহ করে আসুন।"

নির্জন নদীর ধারে শমীকে দাহ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন অধ্যাপকরা। এসেও দেখেন রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের মত অটল, দু'চোখ মুদ্রিত, হাতদুটি জোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। ওঁর সেই অলৌকিক জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে অধ্যাপক দুজন সাহস করে ঘরে

ঢুকতে পারলেন না, বাইরে দাঁড়িয়েই কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে।

একটু পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ডেকে শান্ত সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "শমার দাহ ঠিকমত হয়েছে তো?"

কথা বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে দু'ফোঁটা জল নেমে এল, অমনি হাতের চেটোর উলটো দিক দিয়ে মুছে নিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক স্তব্ধতায় অধ্যাপক দুজন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর চোখের জল দেখে এই দারুণ দুঃখের মধ্যেও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করলেন।

এবার বোলপুরে ফেরার পালা। পথে সাহেবগঞ্জে ট্রেন ঘণ্টাখানেক দাঁড়ায়। ঐ দুজন অধ্যাপকের একজনের মামা ছিলেন সাহেবগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা। আগে থেকে খবর পেয়ে তিনি খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখামাত্র সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বলেন, "রবিবাবু, আপনাকে দেখতে আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। যাক, এভাবে দেখা হয়ে গেল।"

রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মুখে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করেন, যেন কিছুই ঘটেনি। এমন কি, হেসে হেসেও কয়েক মিনিট গল্প করলেন। মামা ভদ্রলোক মহাখুশী। তিনি বেশ জমিয়ে নানান কথা বলতে থাকেন। প্রশ্নও করছেন এটা সেটা।

অধ্যাপক দুজন তো হতবাক! এবং ব্যাপারটা তাঁদের সহ্যেরও একেবারে বাইরে। সুবিধেমতো মামাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে ভাগ্নে অধ্যাপকটি বলেন, "মামা, ওঁকে তুমি এখন বেশি বিরক্ত করো না, জানো—কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের ছোট ছেলেকে সৎকার করে ফিরছেন উনি।"

"অ্যাঁ!"

"না, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না মামা, তুমিই বা বুঝবে কি করে।"

অভিভূত সেই ভদ্রলোক ট্রেন ছাড়ার বাকি সময়টুকু পর্যন্ত একেবারে চুপ। ট্রেন যখন নড়ল, তিনি এবার ঝুঁকে রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে কামরা থেকে নেমে গেলেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরে পরের দিন থেকেই কাজে ডুবে যান রবীন্দ্রনাথ। কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, গলাটা ভার-ভার। স্নেহ-বৎসল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটুক্ষণ পর পর ওঁর ঘরে ঢুকে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল কণ্ঠে ডাকছিলেন—"রবি" "রবি"। চরম বেদনাময় মুহূর্তে ছোট ভাই রবিকে সান্ত্বনা দিতে এসে শোকবিহ্বল বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে আর কোনো কথা ফোটেনি।

'প্রবাসী' মাসিক পত্রে তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে উপন্যাস "গোরা"। সাতদিনের মধ্যে দু'কিস্তি লেখা দেওয়া প্রয়োজন। তখুনি লিখতে শুরু করেন। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যথাসময়ে নির্দিষ্ট কিস্তি ঠিকই পৌঁছে যায়।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তরে লিখলেন, "ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আরো দুঃখ যদি দেন তো তাহাও শিরোধার্য করিয়া লইব। আমি পরাভূত হইব না।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠির উত্তরে জানালেন—"তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ, এত অভাব, এত অপমান পড়িয়া আছে যে, নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপে দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া বসিয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়…।"

এ বেদনা তিনি বাইরে প্রকাশ করেননি। কিন্তু হৃদয়ের গভীর গোপনে সেই মর্মান্তিক দুঃখ চকিতের মতো একবার দেখা দিয়ে যায় অনেককাল পরে। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দীর্ঘ একুশ বছর কেটে গেছে। শান্তিনিকেতন থেকে কি যেন কাজে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য এসেছেন কলকাতায়, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যান দেখা করতে। সন্ধ্যেবেলা। তখন বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। তেতলার ঘরে উঠে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের গায়ে বেশ জ্বর। একা একা ঘরে পায়চারি করতে করতে রীতিমত চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন। হঠাৎ প্রশান্তচন্দ্রকে দেখে লজ্জিতভাবে হেসে বলেন, "একটু জ্বর হয়েছে কিনা, তাই বোধ

হয় মাথাটা উত্তেজিত আছে। কিছু চেঁচিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।"

কিছুক্ষণ কেমন অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে তারপর আচমকা বললেন, "শমীর ঠিক এরকম হত। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও খুব ছোট। তখন থেকে ওকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম। ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতোই গান করতে পারত, আর কবিতা ভালোবাসত। এক এক সময়ে দেখতুম চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিম্বা চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছে। এইরকম দেখলেই বুঝতুম যে ওর জ্বর এসেছে। ওকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিতুম। আমার এই বুড়ো বয়সেও কখনও কখনও সেই রকম হয়।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলেন, "শমীর জন্য অনেক কবিতা লিখেছি। শমী বলত, বাবা কবিতা বল। আমি এক-একটা কবিতা লিখতুম আর ও মুখস্থ করে ফেলত। সমস্ত শরীর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবৃত্তি করত। ঠিক আমার নিজের ছেলেবেলার মতো। ছাতের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াত। দেখতেও ছিল ঠিক আমার মতো।

কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। প্রশান্তচন্দ্র স্পষ্ট দেখেন, একুশ বছর আগেকার স্মৃতির কথা বলতে বলতে ওর দু'চোখের কোণে মুক্তোবিন্দুর মতো দু'ফোঁটা জল ছলকে এল।

কিন্তু মিনিট দুয়েক মাত্র। ব্যস। নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় চলে যান রবীন্দ্রনাথ।

মর্মান্তিক আঘাত পাওয়ার দেনা এখনও যে শোধ হয়নি। এখনও অনেক বাকি। এবার এল বড় মেয়ের পালা।

বড় জামাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি— কলকাতার কোর্টে জামাইয়ের পশার বেশি হবে এবং বড় মেয়েকে সর্বদা চোখের সামনে দেখতে পাবেন।

বিয়ের কিছুদিন পরই মেয়েজামাইকে তাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে এলেন—সোজা কথায়, ঘরজামাই করলেন।

বড় মেয়ে বেলা অসাধারণ সুন্দরী, বরাবরই সে গোটা জোড়াসাঁকোর

ঠাকুর পরিবারের সব চেয়ে আদুরে মেয়ে। বিয়ের পরও মাধুরীলতা (বেলা)-কে দূরে চোখের আড়ালে যেতে হল না দেখে সকলে তো

প্রথম দিকে বেশ কিছুকাল খুব আনন্দের মধ্যে দিন যায়। ওদিকে জামাই শরৎচন্দ্রের কলকাতার কোর্টে প্র্যাকটিসও জমে ওঠে। বেলার প্রতি শরৎচন্দ্র খুব অনুরক্তও ছিলেন। কাজেই সব দিক থেকে শুভ সংবাদ।

কিন্তু সুখের সংসারে কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা দিল ঘোর অশান্তি। পারিবারিক নিষ্ঠুর বিরোধে মধুর বন্ধন ছিঁড়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বড় জামাইয়ের খুব মন-কষাকষি, পরে তা পৌঁছল দারুণ তিক্ততায়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্ত্রী মাধুরীলতা (বেলা)-কে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাড়িভাড়া করে চলে গেলেন। ওখানে তাঁরা দুজনে আর কখনও ফেরেননি। এ বিচ্ছেদও আর জোড়া লাগেনি কখনও।

[এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, তিক্ত বিরোধের প্রধানতম হেতু ছিলেন আরেক জামাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরার স্বামী নগেন্দ্রনাথ। মূল ঝগড়া বড় জামাই বনাম ছোট জামাই। দোষটা উভয় পক্ষেরই। তবে দোষের পাল্লা ছোট জামাই অর্থাৎ মীরা দেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথের দিকেই ছিল বেশি ভারি।

তবুও যে কোনো কারণেই হোক, জোড়াসাঁকোর বাড়ির পরিজনেরা ছোট জামাইয়ের প্রতি অপেক্ষাকৃত পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, যে ছোট জামাইয়ের জন্য বড় মেয়ে এবং জামাই বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে বিদায় নিলেন, সেই ছোট জামাই পরবর্তীকালে নানান অপ্রীতিকর কাণ্ড করেন। অপ্রীতিকর এবং আপত্তিজনক। তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহু অশান্তির চূড়ান্ত। পরিশেষে মীরা দেবী তথা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি—পাকাপাকি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।]

বেলা তার স্বামীর সঙ্গে থাকে ভবানীপুরে। দিন যায়। কিন্তু বেশ

কিছুকাল পর তার শরীর খুব দুর্বল ঠেকে, বিকেলের দিকে কাশি। একদিন উঠল রক্ত। ডাক্তারেরা ভালো রকম দেখেশুনে রায় দেন—যক্ষ্মা। তবে কিনা ঠিকমতো ওষুধপত্র আর যত্ন নিলে সেরে যাবে।

এ দুঃসংবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছয় শান্তিনিকেতনে। কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, শোনামাত্র চমকে ওঠেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ। যক্ষ্মা! তক্ষুনি তাঁর মনে পড়ল হারানো মেয়ে রেণুকা (রাণী)-র স্মৃতি। কাজের পালা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে কলকাতায় এলেন বড় মেয়ের শয্যার পাশে। জিজ্ঞেস করলেন, "বেলি, কেমন আছিস মা?"

বেলা বরাবরই অতি লক্ষ্মী স্বভাবের, শান্তপ্রকৃতির মেয়ে—সাত চড়ে মুখে রা নেই বলতে যা আমরা বুঝি ঠিক সেরকম। বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর আর্চার-এর পেনসিল স্কেচে আঁকা যৌবনের অসামান্য কান্তিমান রবীন্দ্রনাথের কোলে দু বছরের শিশু বেলার অপূর্ব ছবিটি এ যুগে হয়ত অনেকেই দেখেছেন। ওই ছবিতেই শুধু বেলা বাবার কোলে ছিল তা নয়। শমী ও রেণুকা (রাণী)-র মতো সে-ও চিরকাল বাবার খুব ন্যাওটা।

বাবাকে দেখামাত্র অসুস্থতা ভুলে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে। তার ডাগর চোখে ঝাপটা দিয়ে যায় খুশীর হাসি, "বাবা তুমি!"

আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে বসলেন বাবা।

চিকিৎসা চলছে। ডাক্তাররাও ঘন ঘন দিচ্ছেন আশ্বাস। ওষুধপথ্যও ঠিকই আছে। কিন্তু মেয়ের রোগের গতি বিশেষ সুবিধে মনে হয় না।

রোজ দুপুরবেলা রবীন্দ্রনাথ জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে মেয়েকে দেখে আসেন। অনেকক্ষণ—দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে বসে থাকেন তার পাশে।

রোগমুক্তির কোনো লক্ষণ নেই। ধীরে ধীরে হলেও, নির্মম নিশ্চিত গতিতে রোগ অবনতির দিকেই যায়। সোনার পুতুলের মতো অপূর্ব রূপসী মেয়ে দিনের পর দিন ক্রমেই বিছানায় যেন মিশে যাচ্ছে। উঠে বসতে পারে খুব কষ্ট করে। দুধেআলতা রং নিষ্প্রভ, চোখে গভীর ক্লান্তি, দেহের যন্ত্রণা তো আছেই। তাছাড়া আছে মনে চাপা গভীর দুঃখ। গুরুতর সেই পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদের পর তার মনের

আনন্দ, হাসি, গান মুছে গেছে কবে।

শুধু বাবা আসার সময়টা মেয়ের মলিন মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্লান্তিভরা চোখে ঝিকিয়ে ওঠে আশার আলো। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শোনবার জন্য উৎকর্ণ, ওই বুঝি বাবা এলেন। বার বার উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় দরজার দিকে। বাবাকে দেখতে পেলেই মুখে আর হাসি ধরে না। শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়ে নিজের দু' হাতে বাবার হাতখানি আঁকড়ে ধরে বলে, "বাবা, গল্প বল।"

কিন্তু সময়, হায়, নিষ্ঠুর সময় দ্রুত বয়ে যায়। দুপুর তিনটে নাগাদ রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বেলার আয়ত চোখ দুটি জলে টলমল করে। কিন্তু খুব অভিমানী মেয়ে তো। কিছু বলে না, শুধু পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে থাকে।

অসহায় বাবা সবই বোঝেন। আদরের মেয়েকে যে আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না তা তিনি জানেন।

এ সময়ে জরুরী কাজে তাঁকে দিন-পাঁচেকের জন্য শান্তিনিকেতনে যেতে হয়। সেখান থেকে ছেলে রথীন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট—"কাল থেকে কলকাতায় যাবার জন্য মনটা দ্বিধা করছে। জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকাতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। শান্তিনিকেতনে আমি জীবন-মৃত্যুর ওপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এখান থেকে বেলার জন্য যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি, আমার আর কিছু করবার নেই···।"

এ কথা লিখলেন বটে, নিজেকে সরিয়ে কিন্তু রাখতে পারলেন না শান্তিনিকেতনে। মনে পড়ে বেলার জলভরা ডাগর দুটি চোখ, কানে সব সময়ে অনুরণিত হয় মেয়ের আকুল কণ্ঠের "বাবা" ডাক। আদরের মেয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁকেই বার বার খুঁজে ফিরছে, তিনি কি দূরে থাকতে পারেন? ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার আগের মতোই রোজ দুপুরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেন।

রোজ যেমন যান, এদিনও তেমনি মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। বরং অন্য দিনের চেয়ে বেশ খানিকটা সময় আগেই। সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। মেয়ের বাড়ির সদর দরজায় ফিটন দাঁড় করিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন। প্রশান্তচন্দ্র ফিটনেই বসে।

মিনিট ছুয়েকের মধ্যে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। গাড়িতে বসে কোচোয়ানকে বললেন, "গাড়ি চালাও।"

প্রশান্তচন্দ্র ওঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে শান্ত-কণ্ঠে বলেন, "আমি পৌঁছোবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খবর পেলুম, তাই আর ওপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।"

তারিখটা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে। মাধুরীলতা (বেলা)-র বয়েস হয়েছিল মাত্র বত্রিশ বছর। তার কোনো সন্তান ছিল না।

গাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আর কিছু বললেন না। পাথরের মতো স্তব্ধ। গাড়ি জোড়াসাঁকোয় পৌঁছলে প্রশান্তচন্দ্রকে বললেন, "ওপরে চল।"

দোতলার ঘরে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে, যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছেন, এমন ভাবে বললেন, "কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে, ও চলে যাবে। তবু রোজ গিয়ে ওর হাতখানি ধরে বসে থাকতুম। ছেলেবেলার মতো বলত, বাবা গল্প বল। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হল।"

ব্যস চুপ করে রইলেন, ধ্যানমগ্ন। ঘণ্টা ছুই আর একটিও কথা বলেননি।

সেদিন বিকেলে জোড়াসাঁকোয় প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের নিয়ে বিচিত্রা ভবনের বৈঠক। সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নানান আলোচনা হবার কথা।

প্রশান্তচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে আজকের অনুষ্ঠানটা বন্ধ করে দিই ?"

রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দেন, "কেন ? অনুষ্ঠান-সূচী বদলানো হবে কেন ? সবই ঠিকমতো হবে, কিছু বদলাবার দরকার নেই।"

সেদিন সন্ধ্যেয় প্রসন্ন মুখে শান্ত চিত্তে সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে

আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলেন তিনি। হাবেভাবে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। সমবেত সাহিত্যিক তথা সাহিত্য-অনুরাগীদের সন্ধ্যেটা কাটল চমৎকার।

এঁরা বেলার মৃত্যুসংবাদ জানলেন পরের দিনের কাগজে।

অত দুঃখের মধ্যেও নিষ্ঠুর নিন্দুকেরা তাঁকে রেহাই দেয়নি এ কথাটা ভাবলে আজও আমরা বিস্ময়ে এবং বেদনায় হতবাক হই। নগণ্য লেখকদের কথা বাদই দিলাম, তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ও শক্তিধর সাহিত্যিক, সম্পাদক, শিক্ষাবিদরা পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িক পত্র, পুস্তক ও সভাসমিতি মারফৎ যে ভাষায় যে কায়দায় রবীন্দ্রনাথকে জর্জরিত করেছিলেন তার তুলনা বিরল।

নীরবে সব সহ্য করেছেন তিনি। শুধু একবার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় নিজের মৃত্যুকামনা করে লিখে ফেলেছিলেন, "মরতে পারলে বাঁচি··· প্রাণটা জুড়োয়।"

কিন্তু সে শুধু ঐ এক মুহূর্তের জন্য। তার পরই আত্মস্থ হন জ্যোতির্ময় রবি। সমস্ত বেদনাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান সামনের দিকে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দিদি স্বর্ণকুমারী।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দেই মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জার্মানীতে মারা যায় নীতীন্দ্রনাথ। সে ছিল রবীন্দ্রনাথের একমাত্র নাতি। ছোট মেয়ে মীরার একমাত্র ছেলে।

আর এই শেষ নাতি মারা যাওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়েস একাত্তর।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য নীতু গিয়েছিল সুদূর জার্মানীতে।

সেখানে তার আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পৌঁছল কলকাতায় ও বোলপুরে। রবীন্দ্রনাথ দারুণ উদ্বিগ্ন। এ ওর তার কাছে খবর নেন নীতু কেমন আছে। সবাইয়ের মুখেই শোনেন, রোগ ক্রমেই সেরে যাচ্ছে।

মীরা দেবী ছুটে গেছেন জার্মানীতে এবং দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ-এর সহায়তায় পৌছতেও পেরেছেন অসুস্থ সন্তানের রোগশয্যার পাশে। বাবাকে আশ্বস্ত করতে মীরা দেবীও নিয়মিত লেখেন চিঠি। রোগ সত্যি ভালোর দিকে। সকলের নিশ্চিত আশা আর মাস দেড়েকের মধ্যে নীতুকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

কালব্যাধি হঠাৎ আবার চূড়ান্ত খারাপের দিকে মোড় নিল দ্রুত। কয়েকদিন পরেই পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌছয় যে, ডাক্তাররা হাল প্রায় ছেড়ে দিলেন।

অবশেষে একদিন জার্মানী থেকে খবর এল, নীতীন্দ্রনাথ আর নেই। পরের দিন খবরের কাগজের এক কোণে খবরটা ছাপাও হল।

এখন এমন দুঃসংবাদটা রবীন্দ্রনাথকে দেয় কে। কেউই রাজী নয়। শেষে সকলের পরামর্শে রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী একসঙ্গে দুজনে গিয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। উনি তখন একমনে লিখছিলেন। হঠাৎ কেন জানি জিজ্ঞেস করলেন, "নীতুর খবর কিছু জানিস ?"

রথীন্দ্রনাথ জবাব দেন, "হ্যাঁ জানি। ভালো খবর নয়।"

পুরো কথা শুনতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। বললেন, "একটু ভালো আছে ? সেখান থেকে চিঠি কি আজ এল ?"

রথীন্দ্রনাথ এবার জোরে স্পষ্ট স্বরে বলেন, "খবর ভালো না। আজ টেলিগ্রাম এসেছে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছে।"

টেলিগ্রাম ! খবরের কাগজ !

হাতের কলম টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। মুখের ভাব কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বেদনায় বিকৃত থেকে আবার শান্ত হয়ে এল। তবে পুরো সামলাতে পারেননি। টপ টপ করে পাঁচ-ছ' ফোঁটা জল চোখ বেয়ে নামল। ঘণ্টা দুই একলা চুপচাপ বসে রইলেন। চোখ মুদ্রিত, চোখের নীচে অশ্রুর শুকনো দাগ, অচঞ্চল স্থির সেই মহাপুরুষের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস কারো নেই।

দু'ঘণ্টা পর আবার যথারীতি উনি শুরু করেন নির্দিষ্ট কাজকর্ম।

পরের দিন ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তখন 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আয়োজন চলছে। নীতীন্দ্রনাথ মারা গেছেন শুনে অনেকে, প্রায় সকলেই এ উৎসব বন্ধ রাখতে চাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব বন্ধ রাখেননি। এমন কি নিজেও পুরোপুরি অংশ নিলেন। পরের দিন ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে যে চিঠি লেখেন তা অতুলনীয়। এই চিঠিতে তাঁর জীবনবেদ সম্পূর্ণরূপে বিধৃত। চিঠিটিতে পঁচিশ বছর আগে মৃত শমীন্দ্রনাথকেও স্মরণ করেছেন তিনি।

"...সমস্ত ভুলচুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড় কথাটা এই যে আমরা ভালবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ, তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তাহলে সে অভাব হ'ত গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপর আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েছে। এমন বার বার হল, বার বার হবে। এর সুখ, এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। যত বার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ পৃথিবীটা রয়েছে, সে চলছে। অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। নীতু (নীতীন্দ্রনাথ)-কে খুব ভাল-বাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল মনের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে...অনেকে বললে, এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক আমার শোকের খাতিরে। আমি বললুম, সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব।...আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজ ভাবে করে গেছি।

যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাতে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলাম, বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন বার বার করে বলেছি, এরপর যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক। শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম, জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে,

কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে—কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোন সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি…।"

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ও মেজবৌদি জ্ঞানদানন্দিনীর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে সুরেন্দ্রনাথ, মেয়ে ইন্দিরা (বিবি)। এই ভাইপো-ভাইঝি যে রবীন্দ্রনাথের কতখানি প্রিয় ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁরা দুজন ওঁর নিজের ছেলেমেয়ের মতোই। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরারও (বিবি) অসম্ভব টান কাকার প্রতি—প্রাণ দিয়ে ভালবাসা বলতে যা বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের বিপদে-আপদে সুরেন্দ্রনাথ শক্তি, অর্থ, সামর্থ্য নিয়ে দৌড়ে এসেছেন বার বার।

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পংয়ের কাছে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। পঁচিশে বৈশাখ আসন্ন। ওই দিনের দু-তিনদিন আগে এক উৎসবের আয়োজন হল।

স্নান সেরে বাগানে বেদীর ওপর এসে বসেন রবীন্দ্রনাথ, হাত দুটি জোড় করা। সমাহিত মূর্তি। গেরুয়া রংয়ের জামার ওপর মাল্যচন্দনে ভূষিত সেই আশ্চর্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য সকলে দেখছেন তন্ময় হয়ে।. পাহাড়ীরা দলে দলে আসছে ওঁকে ফুল দিতে। বেশ কিছুসংখ্যক তিব্বতীও উপস্থিত। তিব্বতীরা উপহার নিয়ে এসেছে সুতোয় বোনা স্কার্ফ। সমস্ত দিন কাটল অত্যন্ত আনন্দে।

কিন্তু এরই ফাঁকে হঠাৎ পৌঁছয় দুঃসংবাদ-ভরা টেলিগ্রাম। রবীন্দ্রনাথকে খবরটা সেদিন কেউ দিতে চাইলেন না। পরের দিন দেওয়া হবে। সকাল বেলা সকলে মিলে ওঁর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে আছেন। একথা সেকথার পর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ইতস্ততঃ করে বললেন, "একটা খারাপ খবর আছে।"

চমকে ফিরে তাকালেন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ। অপূর্ব আয়ত চোখের

চাউনিতে গভীর শঙ্কা ঘনিয়ে এল।

"খারাপ খবর? কি খারাপ খবর? সুরেনের অসুখ বেড়েছে?"

"তিনি আর নেই। কালকেই খবর এসেছিল। অত লোকজনের মধ্যে বলিনি।"

"তাহলে আর মাথা তুলতে পারতুম না।"

সকলেই ঘর থেকে চলে গেলেন। আড়াল থেকে তাঁরা দেখলেন, তিনি চোখ বুজে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করছেন।

সমস্ত দিন আর একটা কথাও বলেননি। কিন্তু যথারীতি লিখতে বসেন এবং লেখার কাজ ঠিকমতোই চলল। সন্ধ্যের দিকে "মৃত্যু" নামের একটি কবিতা মৈত্রেয়ী দেবীর হাতে দিয়ে বললেন, "জন্মদিন কবিতাগুলোর সঙ্গে এটাও "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দাও।"

অসামান্য সে কবিতাটি এই:

"আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোকদগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।

সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে॥"

অন্ধকার বারান্দায় বসে মৃদু কণ্ঠে একবার শুধু বলেন, "কেউ জানল

না সুরেন কি আশ্চর্য মানুষ ছিল। এমন মহৎ, এমন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, অগোচরেই চলে গেল। যারা জানে, শুধু তারাই বুঝবে—এমন হয় না, এমন দেখা যায় না।"

তারপর নিঃশব্দে বারান্দা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

অবশেষে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ। শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ। একদিন কি মনে হল, রোগশয্যার পাশে সেবারত স্বজনদের ডেকে বলেন, "ওরে, তোরা নতুন বৌঠানের (কাদম্বরী দেবী) একটা ছবি আমাকে দেখাতে পারিস? তাঁকে একবার এখন দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

দীর্ঘ সাতান্ন বছর আগেকার, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম নিদারুণ শোক ঘনিয়ে এল কি ওঁর শেষ প্রহরে!

সকলে মিলে কত খোঁজাখুঁজি। দুখানা ছবি যে ছিল তা সবাই জানে। কিন্তু কই, নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর ছবি কিছুতেই পাওয়া গেল না কোথাও।

বিমর্ষ চিত্তে স্বজনরা রবীন্দ্রনাথকে জানান, "সে ছবি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কথাটা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "পাওয়া গেল না? তবে থাক।"

পাশ ফিরে শুলেন। আর কখনও ফটোর কথা জিজ্ঞেস করেননি।

আশ্চর্যের কথা—কিছুদিন পরে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে নতুন বৌঠানের দুখানা ছবিই পাওয়া যায়।

কিন্তু হায়! জ্যোতির্ময় রবি তখন এ জগৎ আঁধার করে অস্ত গেছেন।